প্রকাশক
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

প্রথম বাংলা সংস্করণ মাঘ ১৩৬৬

মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

যাদের চোখের জল আমার পথ স্বচ্ছ করে দিয়েছে,
যাদের ছড়ানো কাহিনী আমার জীবনের শৃঙ্খলগুলিকে
জুড়ে দিয়েছে,
যাদের মমতা সুন্দর, সরলতা শিব, আর মনুষ্যত্ব সত্য,
যারা জানে না আমার কি উপকার করেছে আর
আমার কৃতজ্ঞতার সঙ্গেও যারা অপরিচিত,
সেই আমার ধূমল চলচ্চিত্রের
চির-উজ্জ্বল আধারগুলিকে—

মহাদেবী

সূ চি প ত্র

ভূমিকা

হিন্দী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি মহাদেবী বর্মার অতি প্রসিদ্ধ গদ্যরচনা 'অতীতকে চলচ্চিত্র' পুস্তকখানি শ্রীমতী মলিনা দেবী বাংলায় অনুবাদ করেছেন জেনে আমার খুব আনন্দ হল। শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা হিন্দীর শীর্ষস্থানীয় কবিদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর গীতিকবিতাগুলিতে নারী-হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলিই যে কেবল ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, এদের মধ্যে খুব উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারারও সঙ্কেত রয়েছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগোচরে রয়েছেন যিনি, যাঁকে কেবল অনুভবে জানা যায়, সেই পরম প্রেমিকের আগমনে উল্লসিত হয়ে সমগ্র জগৎ-সংসার আপনাকে বিচিত্র বর্ণে, রূপে ও রসে নিয়ত চরিতার্থ করতে চাইছে—এই পরম সত্যটিকে মহাদেবী তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে সুন্দর রূপে ব্যক্ত করেছেন। সেই মহান অদৃশ্য প্রেমিককে চিনতে না পারার যে অসীম বেদনা, তা মহাদেবীর এই গীতিকবিতাগুলিতে অত্যন্ত গভীরভাবে মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে। হিন্দী সাহিত্যে তাঁর এই কবিতাগুলির খুবই সমাদর হয়েছে।

কিন্তু মহাদেবী যে শুধু গীতিকবিতার মাধ্যমেই সেই সুকুমার মনোভাবগুলিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন, তা নয়। তাঁর গদ্যরচনায় তিনি যে রেখাচিত্রগুলি এঁকেছেন, সেগুলিও কম হৃদয়গ্রাহী হয়নি। সহজ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং অসাধারণ সহানুভূতিশীল হৃদয় উভয়ই তিনি তাঁর বিধাতার কাছ থেকে পেয়েছেন।

'অতীতকে চলচ্চিত্র' তাঁর এমন একটি গদ্যরচনা, যা পড়ে আমরা তাঁর এই বিশেষ গুণগুলির পরিচয় পাই। গীতিকার অথবা রেখাশিল্পী —কোন্ রূপে যে অধিক সার্থক, বলা কঠিন। বর্ণনীয় বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করে তার মূল রূপটিকে তিনি পরিস্ফুট করতে পারেন এবং

মানুষের আপাতবিরুদ্ধ আচরণগুলির মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধানও মহাদেবীর মত সহানুভূতিশীল লেখিকার পক্ষেই সম্ভব।

এই পুস্তকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, এটি খুবই সুখের কথা। শ্রীমতী মলিনা দেবী এই পুস্তকের অনুবাদ অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা এই অনুবাদ সহৃদয় বাঙালী পাঠককে আনন্দ দেবে। এর আগেও মহাদেবীর 'স্মৃতি কী রেখায়েঁ' গ্রন্থের এঁরই করা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলাদেশে বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে জেনে খুশি হয়েছি। এই পুস্তকটিও সুধীসমাজে অনুরূপ সমাদৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী

[ডঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী হিন্দী সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত ও লেখক। ১৯৩০ সনে তিনি প্রথমে শান্তিনিকেতনে হিন্দীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসেন। এখানে কবিগুরুর সাহচর্যে তিনি অনেককাল ধন্য হয়েছেন। ১৯৫০ সনে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে চণ্ডীগড়ে বাস করছেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি 'হিন্দী বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদনা করেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে কবীর, সূরসাহিত্য, হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা, অশোককে ফুল, বাণভট কী আত্মকথা প্রধান। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষ থেকে তাঁর 'বাণভট কী আত্মকথা' সব ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সাহিত্য সাধনার জন্য তাঁকে ডি লিট উপাধি দিয়ে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। দিল্লীর সাহিত্য অকাদেমীরও তিনি একজন সদস্য।]

লেখিকার নিজের কথা

যে-সব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে আমার চিন্তার পথ খুলে গিয়েছে, আর আমার সংবেদনশীলতা গতিলাভ করেছে, তাদের স্মৃতিকথাগুলি লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে যশ কার প্রাপ্য, সে-বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না। কাহিনীগুলি এক যুগেরও অধিক প্রাচীন, তবু সেগুলি করুণরসে সিক্ত। আমার এক পরিচিত পরিবারের গৃহকর্ত্রী তাঁর বৃদ্ধ ভৃত্যের তুচ্ছ অপরাধে তাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। ভৃত্য অসংখ্যবার ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রীর অহঙ্কার সেই অকারণ দণ্ড রহিত করায় তাঁকে বাধা দিয়েছে।

সেই দরিদ্র অথচ স্নেহসমৃদ্ধ বৃদ্ধ কখনও দুটি শুকনো গাঁদা ফুল, কখনও হাতের ঘামে ভেজা চারটি বাতাসা, আবার কখনও বা মাটির একটা সামান্য খেলনা নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভুদের প্রতীক্ষায় পুলের ওপর বসে থাকত। নতুন চাকরের সঙ্গে সেই ছেলেরা যখন বেড়াতে যেত, তখন এই সব তুচ্ছ, উপহার তাদের হাতে দিয়ে ফিরে যাবার সময় ওর চোখ জলে ভরে উঠত।

উনিশ শ তিরিশ সালে ওই চাকরটিকে দেখে আমার নিজের শৈশব আর সেই সময়কার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত রামার কথা মনে এল। তখন অতীতের সেই অসমাপ্ত কাহিনী লিখে ফেলার জন্য মন ব্যাকুল হল। কিন্তু ধীরে ধীরে রামার এই পরিবার সংখ্যায় বাড়তে লাগল আর অতীতের চিত্রের সঙ্গে বর্তমানের চিত্রও যুক্ত হতে লাগল। উদ্দেশ্য কেবল এই ছিল, সময় যখন তার নিজ তুলিকাস্পর্শে অতীতের এই চিত্রগুলির উজ্জ্বলতা দূর করে দেবে, তখন এই সব স্মৃতিচিত্রের অস্পষ্ট আলোকে আমি আবার তাদের চিনতে পারব।

এগুলি প্রকাশ করা সম্বন্ধে তখন কিছু ভাবিই নি। কারণ এই

স্মৃতিচিত্রের আধার যারা, তারা তো আমার কাছে প্রদর্শনীতে রাখবার জিনিস নয়, তারা আমার অসীম মমতার পাত্র। অন্যের কাছে তারা সম্মান পাবে কিনা তার পরীক্ষার চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকাই আমার ভাল মনে হল।

এ সব স্মৃতিচিত্রে আমার নিজের জীবনও নানা ভাবে এসে পড়েছে। তা আসা স্বাভাবিকও। নিজেদের অভিব্যক্তির পরিধির মধ্যে এনে তবেই আমরা আঁধারের বস্তুগুলিকে দেখতে পাই। তার বাইরে তো এরা অন্তহীন অন্ধকারেরই অংশ থেকে যায়। আমার জীবনের পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো একটি চরিত্র নিজের যে-পরিচয় দিতে পারে, তার বাইরে তো তা পারে না। সেখানে তার রূপান্তর ঘটে। তাই তাদের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা কিছু এসে পড়েছে। প্রয়োজনে পড়ে আমার এই যে আত্মবিজ্ঞাপন তার মূল্য হল সেই ছাইয়েরই সমান যা আগুনটাকে অনেকক্ষণ জিইয়ে রাখার জন্য অঙ্গারগুলিকে ঘিরে থাকে। কিন্তু যাদের দৃষ্টি এর বাইরে না পৌঁছবে, তারা এই চিত্রগুলির অন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না।

যে সঙ্কলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে এগারোটি স্মৃতিচিত্র রয়েছে। শস্তায় পাঠকের মনোরঞ্জন করা যাবে, এই ইচ্ছে নিয়ে আমি এসব ক্ষতবিক্ষত জীবনগুলিকে খেলনার হাটে রাখতে চাই না। এসব অসম্পূর্ণ রেখা আর অস্পষ্ট রঙের সমষ্টির মধ্যে কেউ যদি নিজের ছায়ার একটি রেখাও দেখতে পান, তবেই এগুলি সার্থক হয়েছে মনে করব। নয়তো স্মৃতির সুরক্ষিত সীমার মধ্য থেকে এদের বাইরে টেনে আনা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে বুঝতে হবে।

রামা

রামা যে প্রথম আমাদের বাড়িতে কখন এল, সেকথা আমি জানি না, আমার ভাইবোনেরাও কেউ জানে না। বাবার সেই অনেক রকম জিনিসে ভরা টেবিলটির নীচে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায় আমাদের খেলনার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হত—তার সঙ্গে শৈশবে আমাদের যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল,—সেই আমাদের লোহার স্প্রিংদার প্রকাণ্ড পালঙ্কটি,—যার উপরে শুলে আমাদের কূর্ম আর মৎস্যাবতারের মত দেখাত, সেটিকে যেমন জানতাম, আর মায়ের শঙ্খ-কাঁসরে ঘেরা ঠাকুরটি—যাঁর ভোগ মুখে পুরবো বলে অর্ধেক চোখ বুজে বকের মত ধৈর্যসহকারে ঘণ্টার শব্দ শুনতে বসতাম—তাঁকে যেরকম চিনতাম, ঠিক সেই রকম কালো, বেঁটে, সুগঠিত শরীর রামার পায়ের বড় বড় নখ থেকে মাথার লম্বা টিকি পর্যন্ত সব কিছুর সঙ্গে আমাদের একটা খুব পুরনো পরিচয় ছিল।

সাপের পেটের মত শাদা হাতের চেটো আর গাছের তেড়াবাঁকা সরু ডালের মত আঙুল—ওর সেই হাতের প্রত্যেকটি রেখা আমাদের পরিচিত ছিল। কারণ মুখ ধোবার সময় থেকে শুরু করে শোবার সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ওর যে-যুদ্ধ চলত তার অস্থায়ী সন্ধি হত কেবল গল্প শোনার সময়। পায়ের দশটি আঙুল যেন দশটি বিভিন্ন দিক খুঁজছে আর পায়ের পাতাটি যেন বড়দের মত তাদের সকলকে সামলাচ্ছে। সেই কালো স্থূল পায়ের শব্দ পর্যন্ত আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কারণ দুষ্টুমি করে চুপিচুপি পালিয়ে গেলেও যেন পায়ে ডানা লাগিয়ে ও আমাদের লুকোবার জায়গায় ছুটে গিয়ে পৌঁছত।

শৈশবের স্মৃতিতে একরকম বৈচিত্র্য আছে। আমাদের

ভাবপ্রবণতা যখন গম্ভীর ও প্রশান্ত হয় তখন অতীতের রেখাগুলি কুয়াশার মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠা বস্তুর মত অনায়াসেই স্পষ্টতর হতে থাকে। কিন্তু যদি আমরা তর্কের সাহায্যে তাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে তাদের স্মরণ করতে বসি, তবে জলের ওপর পাথর ছুঁড়ে মারলে শ্যাওলাগুলি যেমন দূরে গিয়ে মিলিয়ে যায়, সেরকম বিস্মৃতি এসে ওদের ঢেকে ফেলে।

রামার ছোট্ট কপালে খুব ঘন ভুরু আর ছোট ছোট স্নেহতরল আঁখি কখনো কখনো স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায়, আবার কখনো আবছা হয়ে-হয়ে একেবারে হারিয়ে যায়। কোনো ক্লান্ত-উদাসীন শিল্পীর হাতের শেষ কাজের মত ভালো করে গড়া হয়নি এরকম মোটা নাক, নিরন্তর শ্বাসের প্রবাহে প্রশস্ত নাসারন্ধ্র, মুক্ত হাসিতে ভরা ঠোঁটদুটি আর কালো পাথরের পেয়ালায় দইয়ের মত ঘন শাদা দাঁত—ওর চেহারার এই ছবিই মাঝে মাঝে আমার স্মৃতিতে ভাসে।

রামার চুল তো কখনো আধ ইঞ্চির চেয়ে বেশি বাড়বার অধিকার পায়নি। তাই লম্বা টিকিটি কেটে নিয়ে তাকেও সাম্যে দীক্ষা দেব বলে আমরা কাঁচি নিয়ে ওর পিছন পিছন ঘুরতাম। কিন্তু ওর নাগাল পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারণ আমরা জেগে থাকতে তো আর রামা ঘুমত না, আর ও জেগে থাকতে এ কাজ করার সৎসাহস আমাদের ছিল না।

আজ হয়তো বলব, রামা কুরূপ ছিল। অথচ সেই সময়ে ওর চেয়ে ভব্য সাথীর কল্পনাও আমাদের পক্ষে অসহ্য ছিল। তখন ওকে আমাদের খুব ভাল লাগত। মনে হয় ওর কুরূপতার কথা ও নিজেই জানত না। সেজন্য কেবল একটি মিরজাই আর হাঁটু পর্যন্ত উঁচু এক ধুতি পরে নিজের কুশ্রী শরীরের অধিকাংশই দেখিয়ে বেড়াত। সাজের যোগ্য সামগ্রীর ওর অভাব ছিল না। কারণ

ঘরের মধ্যে ওর আস্তর-দেওয়া লম্বা কুর্তা, পাগড়ি, বুন্দেলখণ্ডী জুতো আর লাঠি—কোনো এক শুভ মুহূর্তে বেরবার অপেক্ষায় ছিল বলে মনে হয়। ওদের সেই অখণ্ড প্রতীক্ষা আর রামার অটুট উপেক্ষায় দ্রব হয়ে আমাদের কার্যকরী সমিতিতে এই প্রস্তাব নিত্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হত যে, 'কুর্তার আস্তিনে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে খেলাঘরের পর্দা বানাব, ঝুড়ির মতো পাগড়িটিকে খুঁটি থেকে নাবিয়ে পুতুলের জলবিহারের স্থায়ী ব্যবস্থা করব।' অথচ রামা নিজের অন্ধকার দুর্গের দরজার আগল এত উঁচুতে বন্ধ করে রাখত যে আমরা টুলের ওপর দাঁড়িয়েও তাকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারতাম না।

রামার আসা সম্বন্ধে বড় হয়ে যে-গল্প আমরা শুনেছিলাম, তা-ও ভারি অদ্ভুত। একদিন দুপুরে মা বড়ি, পাঁপড় এসবের অক্ষয় ভাণ্ডার রোদে দিচ্ছেন। এর মধ্যে দুর্বল, ক্লান্ত রামা যে কখন এসে প্রাঙ্গণের দ্বারে চৌকাঠের উপর বসে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে কেউ জানে না। ওকে ভিখিরি মনে করে যখন কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা হল, তখন—'ও মাগো, রামা যে খিদেয় মরে গেল গো' বলতে বলতে ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। দুধ-মিষ্টির রসায়নে মা যখন ওকে পুনর্জীবিত করলেন, তখন সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠল। কারণ খিদে তো এমন কোনো রোগ নয় যাতে উপচারের ক্রমভঙ্গ করা যায়।

রামা ছিল বুন্দেলখণ্ডের একটি গ্রাম্য বালক। বিমাতার অত্যাচারে পালিয়ে গিয়ে ভিক্ষে করে করে ইন্দোর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল—সেখানে ওর আপনার লোক কেউ ছিল না। এ অবস্থায় রামা সহজেই আমার মায়ের স্নেহের অধিকারী হয়ে বসল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবা ঘরে ফিরে এসে দেখতে পেলেন লকড়ির ঘরের একটি কোনায় রামার বড় বড় জুতো দুপাটি বিশ্রামলাভ করছে আর অন্য কোনায় ওর লাঠিটি সমাধিস্থ রয়েছে। ও নিজে

হাতমুখ ধুয়ে এসে নতুন সেবাব্রতে দীক্ষিত হয়ে কাজকর্ম বুঝে নিচ্ছে।

বাবা তো ওর অপরূপ রূপ দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে মাকে জিগগেস করলেন, 'ধর্মরাজ, এ কোন লোকের জীব নিয়ে এলেন ?' আমার মা বাড়িতে একটি আজব চিড়িয়াখানাই প্রায় গড়ে তুলেছিলেন। বাবা বাড়ি ফিরলেই দেখতে পেতেন—কখনো একটি খঞ্জ ভিখিরি বাইরের দালানে বসে খাচ্ছে, কখনো বা কোনো অন্ধ পিছনের দরজায় খঞ্জনি বাজিয়ে ভজন শোনাচ্ছে। আবার কখনো কোনো বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠে বসে সিধেগুলি গাঁঠরিতে ভরছে। বাবা মার কোনো কাজে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কিন্তু ওঁকে খ্যাপাতে খুব ভালবাসতেন।

রামাকেও উনি ক্ষণকালের অতিথি মনে করেছিলেন। কিন্তু মা তাড়াতাড়িতে কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আমার নিজের কাজের জন্যই এই চাকরটিকে রাখলাম।' অনেক চাকর থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম নেয় না, সে কেবল নিজের জন্য চাকর রাখবে, এ তো কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। বাবা তো হেসে গড়িয়ে পড়লেন। মজা করে বললেন, 'ঠিকই হয়েছে, নাস্তিকরা যাকে দেখে ভয় পাবে, সেরকম সেবকই তো ধর্মরাজজীর সেবায় লাগতে পারেন।'

অজ্ঞাতকুলশীল রামাকে উনি বিশ্বাস করতে পারেননি—অথচ মার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ পাত্রাপাত্র বিচারের মানদণ্ড ছিল মায়ের সহজাত সমবেদনা। ওঁর সহানুভূতি দিয়ে উনি রামার কুরূপতার আবরণ ভেদ করে ওর সরল হৃদয়ের যে-পরিচয় পেয়েছেন, তাতে উনি অক্ষয় সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন।

এভাবে রামা আমাদের বাড়িতে রয়ে গেল, অথচ ওর কর্তব্য

নির্ধারিত হতে সময় লাগল। সব কাজের জন্যই পুরন চাকর ছিল এবং পূজার কাজ আর রান্নার কাজ মা আর কাউকেও দিতেন না। আরতি, পূজা ইত্যাদি সম্বন্ধে ওঁর নিয়ম যেমন ব্যতিক্রমহীন ছিল, রান্নার ব্যাপারেও তার চেয়ে কম নয়। এক দিকে যেমন ওঁর বিশ্বাস ছিল যে, উপাসনা ওঁর আত্মার জন্য অনিবার্য, তেমন অন্য দিকে ওঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, ওঁর নিজের হাতের রান্না আমাদের সকলের শরীরের পক্ষে একান্ত দরকার।

আমরা ভাইবোনরা সব একে অন্যের চেয়ে দুই দুই বছরের বড় ছোট। সেজন্য আমাদের শিশুকাল আর বড় হয়ে যাওয়ার মধ্যে খুব বেশি একটা ফাঁক ছিল না। নিরন্তর যজ্ঞধ্বংসে ব্যস্ত দানবদের মত আমরা মায়ের সব মহৎ অনুষ্ঠানে বাধা দেবার জন্য তক্কে তক্কে ঘুরতাম। তাই এসব বিদ্রোহীদের বশে রাখার গুরুতর কর্তব্য রামার উপর সঁপে দিয়ে মা খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

রামা সকালে উঠে পূজার ঘর পরিষ্কার করে ওখানকার বাসন-পত্র নেবু দিয়ে ঝকঝকে করে মেজে দিত। তারপর বিছানা থেকে আমাদের ওঠাতে আসত। ওই বড় পালঙ্কে শুয়ে সারারাতের মধ্যে কতবার ওলটপালট খেয়ে কে যে কোথায় গিয়ে পৌঁছত—তার ঠিক নেই। আমাদের সর্বাঙ্গের স্থিতি ঠিক ঠিক বুঝে নেবার জন্য লেপের ওপর দিয়ে ওর হাত একবার ঘুরে যেত। তারপরে কাউকে কোলের রথে, কাউকে কাঁধের ঘোড়ায়, কাউকে বা পায়ে হাঁটিয়েই মুখ প্রক্ষালনের সমারোহে নিয়ে যেত।

আমাদের মুখহাত ধোয়ান তো সহজ কাজ ছিল না। কারণ 'দুধ বাতাসা রাজা খায়' এই মহামন্ত্র তো রামাকে ক্রমাগত জপতেই হত। তাছাড়া আমরা আবার একে অন্যকে রাজা বলে স্বীকার করতে চাইতাম না। রামা যখন আমাকে রাজা বলে ডাকত তখন ছোটভাই বাবু ওর পাখির মত ঠোঁটদুখানি খুলে বলে উঠত, 'লামা,

ওকে কেন তুমি লাজা বললে?' 'র' উচ্চারণে অসমর্থ সেই ছোট্ট পুরুষটির দম্ভ অনেক সময় আমাকে বিব্রত করে তুলত। রামার এক হাতের চক্রব্যূহের মতো আঙুল আমার মাথা আটকে রাখত আর অন্য হাতের চেটো সুদর্শনচক্রের মত আমার মুখের ওপর ঘুরতে থাকত। এত কষ্ট সয়েও অন্যকে রাজত্বের অধিকারী বলে মেনে নেওয়া মানে নিজের অসামর্থ্য প্রচার করা। সে জন্য আমি সাম, দান, দণ্ড, ভেদ নীতির সাহায্যে রামাকে রাজি করাতাম যেন ও আমাকেই কেবল রাজা বলে ডাকে। রামা এসব মহারথীদের সন্তুষ্ট করার অমোঘ মন্ত্র জানত। চুপি চুপি আমার কানের কাছে এসে বলত, 'তুমি তো বড় রাজা, আর ছোট ভাই নতুন রাজা।' আবার কখনো সেই একই কথা ছোট ভাইএর কানের কাছে গিয়ে বলে আসত। কারণ দেখতাম ভাই উৎফুল্ল হয়ে মাজনের কৌটোয় আঙুল দিয়েই দাঁতের বদলে ঠোঁট মাজতে লেগে গেছে। এ কাজে রামার ঘোর নিষেধ ছিল। তাই আমিও এমন গর্বভরে ভাইএর দিকে তাকাতাম যেন সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে ও মূখ সৈনিকের কাজ করছে।

নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে উৎসুক আমরা তিন দেবতা। তাদের অর্চনার জন্য রামা এবার এগিয়ে আসত। ওর সামনে থাকত দুধের পেয়ালা, ফলের থালা আর ছোট-বড় চামচ। কিন্তু ও ভারি ওস্তাদ পূজারী ছিল। কি সাধনার জোরে যে দেবতাদের চোখ বুজিয়ে কাক দিয়ে পূজার জিনিস গ্রহণ করাত জানি না। যখনই আমরা চোখ বুজতাম, তখনই কারো মুখে আঙুর, কারো দাঁতে বিস্কুট, আর কারো ঠোঁটে দুধের চামচ গিয়ে পৌছাত। দেখতে না পাওয়াটা তো আমাদের অভিনয় মাত্র। কারণ আমরা সবাই আধ খোলা চোখে রামার কালো মোটা আঙুলের কসরত দেখতেই পেতাম। আর সত্যি বলতে কি, আমার তো কাকের কালো, শক্ত,

অপরিচিত ঠোঁট সম্বন্ধে ভয়ই ছিল। যদি আধ খোলা চোখে কাল্পনিক কাকের ঠোঁটের জায়গায় রামার হাতের আঙুল না চিনতে পারতাম, তবে তো আমাকে খাদ্যের লোভ ছেড়ে পালাতেই হত।

জলপানের ব্যবস্থা শেষ হতেই রামার তপস্যার ইতি হত না। স্নানের সময় চোখদুটিকে সাবানের ফেনা থেকে বাঁচান, জামা পরানর সময় সেগুলো উল্টো দিকে পরান না হয়ে যায় তা দেখা, খাবার সময় আহারের মাত্রা ঠিক করা, খেলার সময় আবশ্যক মত আমাদের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির অভাব দূর করা, আর শোবার সময় আমাদের গায়ের ওপর ডানার মত হাতদুখানি বিস্তৃত করে গল্প শোনাতে শোনাতে আমাদের স্বপ্নলোকের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসা—এসব রামারই কর্তব্যের অঙ্গ ছিল।

আমাদের প্রতি রামার মমতা যতখানি গভীর ছিল, ওর ওপর আমাদের অত্যাচারও ততখানি সীমাহীন ছিল। একদিন দশহরার মেলা দেখার জন্য জেদ ধরেছিলাম বলে রামা অনেক অনুনয় বিনয় করে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মেলায় নিয়ে যাবার অনুমতি মায়ের কাছ থেকে আদায় করেছিল। খেলনা কেনবার সময়ও আমাদের একজনকে কাঁধের ওপর বসাল, একটিকে কোলে নিল—আর আমার হাতের আঙুল ধরতে ধরতে বলল, 'আঙুল ছেড়ো না, রাজা ভাইয়া।' মাথা নেড়ে স্বীকৃতি দিতে দিতেই আমি আঙুল ছেড়ে মেলা দেখতে যাবার সঙ্কল্প করে নিলাম। ঘুরতে ঘুরতে ভিড়ের চাপ থেকে বেঁচে যখন খুব খিদে পেল তখন স্বাভাবিক ভাবেই রামার কথা মনে এল। এক মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব উদ্বেগ চেপে রেখে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি রামাকে দেখেছ? ও হারিয়ে গেছে।' বুড়ো হালুইকর বাৎসল্যভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তোমার রামাকে দেখতে কি রকম?' আমি বেশ খুশি হয়ে চোখ টিপে বললাম, 'খুব ভাল।' এ-পরিচয়ে রামাকে চিনতে পারা কত অসম্ভব তা

বুঝেও বৃদ্ধ আমাকে কিছুক্ষণ ওখানে বসে বিশ্রাম করতে বলল। আমার পাদুটো ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে গেছে, আর দোকানের মিষ্টি সাজানো থালার মধ্যেও কম আকর্ষণ ছিল না। তাই দোকানের এক কোণায় পাতা চটের ওপর বসে সম্মানিত অতিথির মতো বুড়োর কাছ থেকে মিষ্টির অর্ঘ্য গ্রহণ করে ওকে আজকের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলাম।

এ দিকে মেলায় আমাকে খুঁজে খুঁজে রামার প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। সন্ধ্যার সময় সকলকে জিজ্ঞেস করে করে অনেক কষ্টে রামা যখন সেই দোকানের সামনে এসে পৌঁছল তখন আমি বিজয়গর্বে উল্লসিত হয়ে বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, তুমি এত বড় হয়েও হারিয়ে যাও, রামা ?' রামার শুকন মুখে হিমকণার মতো এক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ও আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দিক থেকে এমন ভাবে দেখতে লাগল যেন আমার কোনো অঙ্গ মেলায় খোয়া গেছে কি না পরীক্ষা করছে। ঘরে ফিরে এসে জানলাম যে বড়দের অভিধানে ছোটদের এই বীরত্বের নাম অপরাধ। কিন্তু আমার অপরাধ নিজের ওপর টেনে নিয়ে বকাঝকা সমস্ত রামাই সহ্য করল। আর সে দিন সবাইকে ঘুম পাড়াবার সময় ওর বাৎসল্যভরা চাপড়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিলাম আমি।

একবার সুচতুর ভাষ্যকারের মতো রামা নিজের জিনিস আর পরের জিনিসের তফাত আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর যায় কোথায়! কোথা থেকে কোন পরের জিনিসটা এনে রামার ছোট চোখদুটিকে হতাশ বিস্ময়ে ভরে দেব—এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল।

আমাদের বাড়ির ওপরকার ছাত পেরিয়ে অনায়াসে পাশের বাড়িতে যাওয়া যেত। অবশ্য এক বিঘৎ চওড়া একটা ফাঁক ছিল, সেখান থেকে পা পিছলে পড়লে পাতালে প্রবেশও সহজ হয়ে যেত।

ওই বাড়ির উঠনের ফুল পরের দ্রব্যের মধ্যে পড়ে, এটা ঠিক করে নিয়ে আমরা দুপুরে কেবল রামাকে বিরক্ত করার জন্যই সেই আকাশমার্গে ফুল চুরি করতে গেলাম। কারো পা যদি পিছলে যেত তবে ব্যাপার অন্য রকম দাঁড়াত। কিন্তু ভাগ্যের জোরে আমরা অন্য ছাত পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে গেলাম। নীচে নামবার শেষ সিঁড়ির ওপর একটি কুকুর ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে বসেছিল। ওদের দেখেই আমরা বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মত বদলে ফেললাম। অর্থাৎ ফুলের বদলে এবার কুকুরছানা চুরি করাই স্থির হল।

যেই আমরা একটা কুকুরছানা তুলে নিয়েছি, অমনি সেই নিরীহ-মত মা নিজের অধিকার ঘোষণার চিৎকারে আকাশ ফাটাতে লাগল। বৈঠকখানা থেকে গৃহস্বামী ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন আর শোবার ঘর থেকে গৃহস্বামিনীও ছুটে এলেন। আমরা ভারি অসুবিধায় পড়ে গেলাম। এ-অবস্থায় কি করা যায় তা তো রামার শেখান ব্যাখ্যায় ছিল না। তাই আমরা নিজেদের বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত ঘটনাটাই প্রকাশ করে দিলাম। বললাম, 'আমরা ছাতের পথে ফুল চুরি করতে এসেছি।' গৃহস্বামী হেসে ফেলে বললেন, 'তা নিচ্ছ না কেন?' উত্তরে আরো গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এবার কুকুরছানা চুরি করব।'

কুকুরছানা নিয়ে যখন আমরা ঠিক পথে বাড়ি ফিরলাম, তখন রামা আমাদের ডাকাতির কথা জানতে পারল। নিজের উপদেশরূপী অমৃতবৃক্ষে এই বিষফল ফলতে দেখে ও কি করবে ভেবে পেল না। সেই আকাশপথে ভ্রমণকারী ডাকাতদলের সর্দারের দুই কান ধরে ওপর দিকে তুলে বলল, 'বলো, বলো কেন গিয়েছিলে সেখানে।' প্যানপেনে কান্না আমার ভারি বিচ্ছিরি লাগত, তাই দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে এই অভূতপূর্ব দণ্ড সহ্য করলাম। আর পরে খুব সংযত ক্রোধে মাকে বললাম, 'রামা আমার কানদুটো লম্বা আর বড়ো

করে দিয়েছে। এখন ডাক্তার ডাকিয়ে এগুলো ঠিক করিয়ে দাও আর রামাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখ।' মা তো আমার অপরাধ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না আর রামা প্রাণ থাকতে সে কথা বলবে না। তাই শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করার জন্য একটি মনোবৈজ্ঞানিক উপদেশ ওকে শুনতে হল। ও নিজের ব্যবহারের জন্য সত্যিই লজ্জিত ছিল। কিন্তু ওর রাজা ভাইয়াকে ও যতই ভোলাতে চেষ্টা করে ততই তার কানের কথা মনে পড়ে যায়। আবার সন্ধ্যার সময় রামাকে চুপ করে বাইরে বসে থাকতে দেখে আমি নিজেই, 'একটা গান শোনাও না' বলে সন্ধির প্রস্তাব করে ফেললাম। রামা একটা ভজনই কেবল জানত আর যে ভাবে ও ওটা গাইত, তাতে গাছের পাখি, এমন কি কাক পর্যন্ত উড়ে পালাবে। তবু আমরা সেই অপূর্ব গায়কের অদ্ভুত শ্রোতা ছিলাম। রামা কেবল আমাদের জন্যই গাইত আর আমরা কেবল ওর জন্যই শুনতাম।

আমার শিশুকাল সমসাময়িক মেয়েদের চেয়ে কিছু অন্য রকম ছিল, সেজন্য রামারও তাতে বিশিষ্ট একটা স্থান আছে। সে সময়ে পরিবারে কন্যাদের অভ্যর্থনা হত না। উঠনে গায়িকারা, দরজায় নহবতওয়ালা আর পরিবারের বুড়ো থেকে বালক পর্যন্ত সবাই ছেলের অপেক্ষায় বসে থাকত। যখনই চাপা গলায় লক্ষ্মীর আগমন সংবাদ দেওয়া হত তখনই ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত নিরাশায় ভরে যেত। বৃদ্ধারা মূক গায়িকাদের চলে যেতে সঙ্কেত করতেন, বৃদ্ধরা বাজনদারদের নীরবে বিদায় দিতেন।

আমাদের বংশে কখনো এরকম হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত যখন কোনো দেবী আবির্ভূতা হলেন না তখন সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ অশ্ব বিনা যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না, তেমনি কন্যা বিনা কন্যাদান যজ্ঞ করাও সম্ভব নয়।

অনেক প্রতীক্ষার পরে যখন আমার জন্ম হল, তখন ঠাকুরদা সেই মহা সৌভাগ্যকে কুলদেবী দুর্গার বিশেষ অনুগ্রহ মনে করলেন। তাঁর সম্মানের জন্য নিজের ফারসি জ্ঞান ভুলে গিয়ে তিনি এমন এক পৌরাণিক নাম খুঁজে নিলেন, যার বিরাটত্বের জন্য কেউ আমাকে কখনো ছোটোখাটো ঘরোয়া নাম দিতে সাহস পর্যন্ত করে নি। নামের উপযুক্ত করে আমাকে গড়ে তোলার জন্য শৈশব থেকেই আমার মাথায় এত বিদ্যাবুদ্ধি ঢোকান হত যে, তাতে মাঝে মাঝে আমার মন বিদ্রোহ করে বসত। নিরক্ষর রামার স্নেহচ্ছায়া বিনা আমি জীবনের সরলতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারতাম কি না সন্দেহ।

আমার হাতে-খড়ি হয়ে গেলে পর, 'আ'এর উপর আঙুল রেখে 'আম, আলমারি, আজ' ইত্যাদি বলে খানিক মনের কথা বলে নিতাম। এ-অবস্থায় আমার ভাইবোনদের চোখে আমি শুক্রাচার্যের চেয়ে নেহাত কিছু কম ছিলাম না। ওদের সব কাজের সমর্থন বা বিরোধ আমি বইয়ের মধ্যে খুঁজে পেতাম। তাই তাদের সমস্ত ক্ষণ সতর্ক থাকতে হত। ছোট্ট বাবু কখনো লাফিয়ে উঠেছে তো আমি অমনি বই খুলে পড়ে শুনিয়ে দিতাম, 'বাঁদর এলরে নাচ দেখাতে—।' বোন মুন্নী রেগে উঠলেই পড়ে যেতাম, 'রাগী মেয়েকে কে সামলাবে ; গরজ পড়লেই দৌড়ে আসবে।' সে বেচারারা আমার শাস্ত্রজ্ঞান দেখে ভারি মুষড়ে পড়ত। কারণ আমার কোনো কাজের জন্য দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করা তো তখন ওদের ক্ষমতার বাইরে।

অথচ এই অক্ষরজ্ঞানী শুক্রাচার্যটি নিরক্ষর রামার কাছে পরাজিত হয়ে যেতেন। গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, প্রবাদ—এ সবের এমন একটি বৃহৎ কোষ ওর আয়ত্তে ছিল যে শুধুমাত্র পুস্তকের জ্ঞানে তাকে হারান যেত না।

আমার পণ্ডিতজির সঙ্গে রামার কিছু ঝগড়া ছিল না। কিন্তু

যখন খেলনার সংসারের মধ্যে থাকতে থাকতেই আমার জন্য মৌলবি সাহেব, সঙ্গীত শিক্ষক আর ড্রইং-মাস্টার এসে গেলেন, তখন ওর হৃদয় ক্ষোভে ভরে গেল। কারণ ও জানত যে এত বিদ্যার ভার আমি বইতে পারব না।

মৌলবি সাহেবকে তো আমি এত ভয় করতাম যে, এক দিন পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য বড় ঝুড়ির মধ্যে বসেছিলাম। দুর্ভাগ্য-বশত সে ঝুড়িতে গোটাচারেক আম ছিল। ওটা খালি করে অন্য কিছু রাখবে বলে রামা ওটা মায়ের কাছে নিয়ে এল। ঢাকা তুলতেই আমি দৌড়ে পালান ছাড়া গত্যন্তর দেখলাম না। শেষ পর্যন্ত রামার আর মায়ের চেষ্টায় উর্দু পড়ার হাত থেকে রেহাই পেলাম।

ড্রইং-মাস্টারের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। কারণ উনি খেলায় বাধা দিতেন না। যে কোনো কাগজের ওপর দুট রেখা সোজা দাঁড় করিয়ে তার ওপর একটা গোল্লা বসিয়েই আমি রামার ছবি এঁকে দিতাম। অন্য কাউকে আঁকতে হলে এই ছাঁচের ওপর একটুখানি রকম ফের করে দিতে হত।

নারায়ণ মহারাজের ওপর আমরা কেউ প্রসন্ন ছিলাম না। প্রথম দিন যখন উনি আমার সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন তখন আমি বলেই ফেললাম, 'আমি রামার কাছে গান শিখি।' গান শোনাতে বলতেই রামার সেই ভজন এমন বিচিত্র ভাবভঙ্গি করে শুনিয়ে দিলাম যে, উনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তার পরেও যখন আমার সেবকগুরু রামাকে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর গায়ক বলে স্বীকার করলেন না, তখন আমার পক্ষে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠা কি খুব অস্বাভাবিক?

রামাকে ছাড়াও সংসারের কাজ চলতে পারে, এ কথা আমরা কিছুতেই মানতে পারতাম না। মা যখন দশ পনের দিনের জন্য দিদিমাকে দেখতে যেতেন, তখন ঘরদোর সামলান আর বাবার দেখাশোনা করার জন্য রামাকে থাকতে হত। ওকে ছেড়ে আবার

আমরাও কোথাও যেতে চাইতাম না। তাই মা আমাদেরও রেখে যেতেন।

অসুখ বিসুখের সময়ও রামার চেয়ে বেশি সেবাপরায়ণ আর সতর্ক ব্যক্তি পাওয়া কঠিন ছিল। একবার যখন আমার ছোট ভাইএর বসন্ত হল, তখন ও ওপরের ঘরে সমস্ত ক্ষণ থাকত। তখন আমাদের আর ভাইয়ের কথা মনেই আসে নি। ওর সতর্কতার জন্যই সেবার আমাদের আর কারো বসন্ত হয় নি।

অন্য একবার ওর জন্যই আমি এক ভয়ানক রোগের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ইন্দোরে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল। তাই আমরা শহরের বাইরে গিয়ে থাকতাম। মা আর মাস কয়েকের ছোট ভাইটি এত অসুস্থ ছিল যে, বাবা আমাদের তিন জনের খোঁজখবর করার সময়ই খুব কম পেতেন। এ-সময়ে রামা ওর স্নেহ দিয়ে আমাদের এমন ভাবে ঘিরে রাখত যে, কোনো অভাবই আমরা টের পেতাম না।

এক দিন আমগাছের ডালে ঝোলান দোলনায় বসে রামার কাছে গল্প শুনছিলাম। এমন সময় আমার কানের পাশটা ফুলে জ্বর এল। রামার কাছে এক বার একটা গল্প শুনেছিলাম যে, এক বুড়ির ফোলা পা থেকে একটা ব্যাঙ বেরিয়ে এসেছিল। রামাকে কানটা দেখিয়ে বললাম, আমার মনে হচ্ছে আমার কান থেকেও একটা ব্যাঙ বেরোবে। রামা বেচারা তো আমার কান দেখে একে বারে চুপ হয়ে গেল। তার পর গরম ইঁটের টুকর ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে অনেক ক্ষণ ধরে সেঁক দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে নানা দেব-দেবীর নাম বলতে লাগল। দু দিন দু রাত আমার বিছানার পাশ থেকে নড়লই না। তৃতীয় দিনে আমার কানের ফোলা কমে গেল কিন্তু রামার খুব জ্বর এল। সঙ্গে সঙ্গে ওর কানের পাশটাও ফুলে উঠল। সেটা পরে কাটতে হয়েছিল। কিন্তু ও এই ভেবেই খুশি ছিল যে আমি তো সব কষ্ট থেকে বেঁচে গেছি।

মা যখন এক দিন ওর বিছানার পাশে আমাদের নিয়ে গেলেন, ওর ক্ষীণ শরীরে যেন একটি উৎসাহের তরঙ্গ খেলে গেল। মা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'রামা, তুমিই তো একে বাঁচিয়েছ। আমি যদি তোমাকে না বাঁচাতে পারতাম তো জীবনভর আমার আপসোস থেকে যেত।' শুনে রামা ওর লম্বা নখওয়ালা হাতে মায়ের পা ছুঁয়ে চোখ মুছতে লাগল।

এবার রামা সেরে উঠতেই মা বললেন, 'এবার তুমি নিজের সংসার পেতে ঘর কর।' 'মায়ের যেমন কথা! আমার রাজা ভাইয়ারা বেঁচে থাকুক। ওরাই এক রকম করে আমাকে চালিয়ে নেবে'—এই ছিল ওর একমাত্র উত্তর। ওর ভাবী শিশুদের লক্ষ্য করে যে ও এতই গালাগাল দিত, আমরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাদের কল্পনা করে নিতাম।

অবশেষে এক দিন যখন ঘর থেকে লাঠি, জুতো ইত্যাদি বের করে নিয়ে গোলাপী পাগড়ি মাথায় বেঁধে রামা উঠনে এসে দাঁড়াল, তখন আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ তাকে এত সাজগোজ করতে আমরা তো কখনো দেখি নি। লাঠির ওপর সন্দেহভরা দৃষ্টি ফেলে আমি জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'রামা, তুমি বুঝি ওই বাচ্চাগুলিকে মারতে যাচ্ছ?' রামা লাঠি ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ রাজা ভাইয়া, সেই সব্বনেশেদের এটা দিয়ে মেরে শেষ করব।'

রামা চলে গেল। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত কল্লুর মায়ের কঠোর হাত থেকে বাঁচার জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করতে হত। এ ভাবে আমাদের পক্ষে অনন্তকাল আর অন্যদের চোখে কয়েক দিন পর এক সকালে পাগড়ি আর গোলাপী ধুতি পরে রামা দরজায় এসে দাঁড়াল; আর 'রাজা ভাইয়া, রাজা ভাইয়া' বলে ডাকতে লাগল। আমরা সবাই পড়ি কি মরি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দা

পর্যন্ত গিয়েই লজ্জার চোটে থমকে গেলাম। রামা তো একা নয়। ওর পিছনে লাল সাড়ি পরে, হাতে চুড়ি, পায়ে মল, ঘোমটা-পরা যে বৌটি দাঁড়িয়েছিল, সে আমাদের যতখানি উৎসুক করেছিল আবার ততখানিই শঙ্কিত করে দিল।

মুন্নী যখন রামার কুর্তা ধরে ঝুলতে লাগল, তখন নাকের ডগা পর্যন্ত টানা ঘোমটার ভিতর থেকে দুটি তীক্ষ্ণ চোখ সে কার্যের মূক প্রতিবাদ জানাতে লাগল। বাবু যখন রামার কাঁধে চড়বার জন্য জেদ ধরল, তখন সেই ঘোমটার নীচে লুকন মাথায় এক নিষেধ সূচক কম্পন দেখা গেল। আমি যখন ঝুঁকে পড়ে নতুন মুখখানা দেখতে চাইলাম, অমনি মূর্তিটি ঘুরে দাঁড়াল। এমন একটি আগন্তুকের প্রতি কি করে আমরা প্রসন্ন হতে পারি ?

আমাদের খেলনার নগর প্রতিষ্ঠায় রামা এতকাল বিশ্বকর্মা আর ময়দানব দুয়েরই কাজ করেছে। কিন্তু এখন ও আর সময়ই পাচ্ছিল না। ও এদিকে আসলেই সেই ঘোমটা-পরা মূর্তি পেছন পেছন এসে পড়ত। তার মূক অসহযোগে রামার আর আমাদেরই নয় শুধু, খেলার পুতুলগুলোরও যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। তাই এর প্রতিকারের জন্য এক দিন আমাদের যুদ্ধসমিতি বসল। রাজাকে তো উঁচু জায়গায় বসান চাই। তাই আমি টেবিলের ওপর উঠে বসে পা দোলাতে লাগলাম। মন্ত্রী মশাই চেয়ারে আর সেনাপতিজি টুলের ওপর বসে পড়লেন।

রাজা চিন্তিত ভাবে বললেন, 'রামা একে কেন নিয়ে এল ?' মন্ত্রিজি গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে সেই একই কথা বললেন। আর সেনাপতি মশাই তখনো কিন্তু 'র' বলতে পারেন না। সেটা ঢাকবার জন্যে চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'ছত্যিই তো, একে কেন আনল ?'

সেই সমিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল, আমাদের একচ্ছত্র অধিকার যে ক্ষুণ্ণ করতে চায়, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে দণ্ড

পেতেই হবে। রীতি অনুযায়ী এই কর্তব্যভার সেনাপতির উপরই পড়ল। রামার বৌ যখন রুটি গড়ত, তখন বাবু চুপিচুপি গিয়ে ওর রান্নার জায়গায় বিস্কুট রেখে আসত। ও যখন স্নান করত, তখন কাঠি দিয়ে ওর শুকন কাপড় নিচে ফেলে দিত। এভাবে কত রকমের শাস্তি যে ওকে পেতে হল তার ঠিক নেই ; তবু কিন্তু ক্ষমা চাওয়া কি সন্ধির প্রস্তাব করা—কোনোটাই ও করল না। বরং আমাদের ওপর রেগে গিয়ে ও রামার ওপর এর শোধ তুলত। কঠোরতার অভেদ্য অবগুণ্ঠনে ওর মুখ ঢাকা রইল। আর ওর কালো চোখের তারায় রাগের ছায়াও আমরা দেখতে পেলাম। আমাদেরই মত অবোধ রামা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, পরে দুঃখ বোধ করতে লাগল। অবশেষে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওর সমস্ত সময় আর ভালবাসা কি করে যে এই স্ত্রীলোকটির চরণে সমর্পণ করতে পারে—তা ওর বুদ্ধিতেও আসত না। শেষে এক দিন রামার বৌ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল।

রামা এই অপ্রিয় বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যেন বেঁচে গেল। কারণ দেখতে পেলাম, ও আমাদের খেলনার রাজ্যের চিরপ্রসন্ন বিধাতা হয়ে আবার বিরাজ করছে। কিন্তু মা তো আবার কোনো রকম অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। তাই রামার কর্তব্য সম্বন্ধে ওঁর উপদেশ ওকে শুনতেই হল।

এবার যে রামা গেল আর ফিরল না। অনেক দিন পরে শোনা গেল, বাড়ি গিয়ে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা টাকা পাঠালেন, আসতে লিখে দিলেন, কিন্তু ওর আর আসা হল না। আমরা সমস্ত খেলনা ফেলে রেখে কত সময় ওর আশায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। বাবু সাত সমুদ্র পারে যাবার জন্য তৈরি ছিল, কেবল পক্ষীরাজ ঘোড়ার অভাবে ওর সে-যাত্রা স্থগিত রইল। মুন্নী নিজের রেলে চেপে পৃথিবী ভ্রমণে বেরতে চাইত, কিন্তু লাল সবুজ নিশান

দেখাবার লোক না থাকায় সেটা চলতেও পারত না, ঠিক জায়গায় থামতেও পারত না। আমারও অবশ্য সে সময় পুতুলের বিয়ে দেওয়া নেহাত দরকার ছিল; কিন্তু পুরোহিতের অভাবে শুভলগ্ন নিত্য পিছিয়ে যেতে লাগল।

এ দিকে আমাদের সব চেয়ে ছোট ভাইটি আড়াই বছরের হয়ে আমাদের সমস্ত তৈরী জিনিস ভাঙার কাজে তৎপর হয়ে উঠল। ওকে সমস্ত খেলনার মাঝখানটায় বসিয়ে আমরা সবাই মিলে বারবার করে রামার কথা শুনিয়ে দিয়ে বলতাম, রামা যখন গোলাপী পাগড়ি পরে, লাঠি নিয়ে ফিরে আসবে, তখন বুঝবে মজাটা। কিন্তু আশ্চর্য, এই গল্পের উপসংহারের জন্যও রামা আর ফিরল না।

এখন আমি এত বড় হয়ে গিয়েছি যে রাজা ভাইয়া বলাবার জন্য জেদ করা স্বপ্নের মত মনে হয়। শৈশবের ঘটনাগুলো কল্পিত কাহিনীর মতই মনে পড়ে। খেলনার সাম্রাজ্যের যে-সৌন্দর্য, তাকেও ভ্রান্তি বলেই জানি। অথচ রামা আজও সত্য, সুন্দর আর স্মরণীয় হয়ে আছে। রামার যে বিরাট ছায়া আমার অতীতকে জুড়ে আছে, তা বর্তমানের সঙ্গে বেড়েই চলেছে—নির্বাক, অতন্দ্র আর স্নেহসিক্ত।

বৌদি

অনেক বছর কেটে গেল তবু আমার স্মৃতিতে সেই করুণ, কোমল মুখ দিন দিন যেন আরো সজীব, আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

ছোট গোল মুখের তুলনায় কিছু বেশি চওড়া ললাট, তার দু পাশে দু গোছা রুক্ষ চুল। দীর্ঘপক্ষ্ম চোখের ভারী পাতা আর তার নীচে বড় বড় বিস্ফারিত চোখদুটি যেন শৈশব ও প্রৌঢ়তা দুটিকেই বন্দী করে রাখার চেষ্টা করছে। সেই ছোট মুখের পক্ষেও ছোট খাড়া নাক আর খোলা ঠোঁটদুটির স্মৃতি সময়ের প্রবাহে কিছুটা ফিকে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখনও আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যেতে পারে নি।

ঘরের সব রকম নোংরা এবং পরিষ্কার, সহজ এবং কঠিন কাজ করায় মলিন রেখাজালে আচ্ছন্ন হাত দুটিতে, কোথাও কোমল, কোথাও কঠোর, কালো রেখায় জড়ান ক্লান্তিহীন সরু আঙুলে, হাতের বোঝা বইতেও অসমর্থ দুর্বল ফর্সা বাহুদুটিতে আর ভারী ঘেরওয়ালা মাড়োয়ারী ঘাগরা পরে ক্লান্ত মত চেহারায়, লম্বা লম্বা আঙুলওয়ালা দুখানি ছোট পায়ে যে সৌকুমার্যের আভাস পাওয়া যেত তা কি কখনো ভোলা যায়? ঐ হাতদুখানি শৈশবে কতবার আমার খোলা চুল নরম হাতে বেঁধে দিয়েছে। সেই পাদুটি তাদের শেখা গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে আমি এলে দরজা খুলে দেবে বলে উঠনের এক দিক থেকে অন্য দিকে দৌড়ে এসেছে। আমার আট বছর বয়সের অপরিণত বুদ্ধি যে কি করে তাঁর সঙ্গে বৌদি সম্পর্ক পাতাল তা এখন বলা মুস্কিল। আমার সহপাঠিনীদের মধ্যে অনেকের খুব ভাল ভাল বৌদি ছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি অথচ আমার আপন তো দূরের কথা, দুঃসম্পর্কেরও কোনো বৌদি না থাকার অভাব পূর্ণ করেছিল সেই মাড়োয়ারী বৌটি।

ছোটবেলার সেই মিশন স্কুলের কথা এখনও মনে পড়ে। সেখানে প্রার্থনা আর পাঠ্যক্রমের একঘেয়েমিতে আমি এত বিরক্ত হয়ে পড়তাম যে প্রতিদিন ঘরে ফিরে আসার পর থেকে না ঘুমন পর্যন্ত পরদিন সকালে স্কুলে না যাবার অজুহাত খুঁজতাম। সে সব দিনে আমার সব চেয়ে ঈর্ষার পাত্রী ছিল আমাদের বাড়ির ঝিয়ের মেয়েটি। সে বাসনকোসন ধুত, রান্নাঘরের কাজকর্ম করত, তবু ঘরে তো অন্তত থাকতে পেত। যে-কঠোর ঈশ্বর আমার ভাগ্যে নিত্য স্কুলে যাওয়া লিখে দিয়েছেন, তিনি মায়ের ঠাকুরদের মধ্যেই কেউ একজন, কি মিশনের সিস্টারদের যীশু—এটা ঠিক করতে না পারায় মহা দ্বিধায় পড়ে যেতাম। মায়ের ঠাকুরদের মধ্যে কোনো একজন যদি হন তো আরতি কি পূজায় ফাঁকি দিলে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার ঘরে থাকার সময় আরো কমিয়ে দেবেন। আর যদি স্কুলের যীশু হন তবে মিথ্যা অজুহাতে স্কুল কামাই করলে পড়ার ঘণ্টা আরো বাড়িয়ে দেবেন—এই দুর্ভাবনায় আমার মন পূজা, আরতি, প্রার্থনা—এসবের মধ্যেই ঘুরে বেড়াত।

অবশ্য এই অন্ধকারের মধ্যেও আলোর একটি ক্ষীণ রেখা দেখতে পেতাম। স্কুল কাছে ছিল বলে বুড়ি কালুর মা বইপত্র নিয়ে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসত আর বিকেলে আবার ফিরিয়ে আনত। আসা যাওয়ার সময়ে কখনো রাস্তায় কুকুরের ঝগড়া, কুকুর ছানাদের ঘুরে বেড়ান, এক কোণায় বসে হাতের থাবায় মুখ ঘষছে একটি বিড়াল, কোনো ঘরের বারান্দায় খাঁচার মধ্যে মানুষের স্বর সাধনা করছে এরকম ময়না; কখনো হাঁস আর তিতিরের দল, টুপি মাথায় বানর, ওড়না-পরা বানরী, নাচুনে ভাল্লুক ইত্যাদি স্কুলের একঘেয়েমি দূর করত।

আমাদের উঁচু ঘরের থেকে একটু দূরে নীচু মতন একটি দোকান। তার একটা দিক সাদা আর রঙিন, সুতী আর রেশমী কাপড়ে

বোঝাই, আর অন্য দিক ঝকমকে পিতলের বাসনে সাজান। এক বৃদ্ধ দোকানদার সেখানে বসে থাকেন—তাঁকে আমি কখনো খেয়াল করে দেখি নি।

কিন্তু সেই ঘরের পিছনের দরজায় পুরান চটের পর্দার ফুটো দিয়ে যে-ছুটি চোখ আমাকে রোজ আসতে যেতে দেখত তাদের প্রতি মনে একরকম কৌতূহল জেগেছিল। এক একবার ইচ্ছে হত, পর্দার ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখি। কিন্তু কালুর মার ভয়ে সাহস পেতাম না। ওর কথা না শুনলে ও স্নানের সময় আমার সদ্য বেঁধান কানে ব্যথা দিয়ে দেবে; বিনুনি করার সময় চুলগুলোকে খুব কষে টেনে বাঁধবে; জামা পরাবার সময় আঁট গলার ফ্রক চোখ পর্যন্ত ঢুকিয়ে আটকে রাখতে পারে; ঘরে আর স্কুলে আমার বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা অনেক রকম নালিস চালাতে পারে। মোট কথা প্রতিশোধ নেবার অনেক অস্ত্র ওর হাতে ছিল।

সেই চোখের অধিকারিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়াটা কালুর মার পছন্দ না হতে পারে; কিন্তু তার বিষয়ে অনেক কথা ও আমাকে শোনাত। সেই বৌটি যেমন অনাথা তেমন অভাগিনীও। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও বৃদ্ধ শেঠ ওকে এনে নিজের এক মাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল; আর সেই বছরই ছেলেটি বিনা অসুখে মারা গেল। এখন এই বৌটির চঞ্চলতায় শেঠজি মহা উত্যক্ত। একেও কোথাও যেতে দেয় না, বাড়িতে কাকেও আসতে দেয় না। কেবল অমাবস্যা পূর্ণিমার দিনে এক ব্রাহ্মণী আসে। শেঠজি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে সিধে দেওয়াবার ব্যবস্থা করেই বিদায় দেয়। কিন্তু বৌয়ের আক্কেল দেখ —শ্বশুর দোকানে যেতেই ও পর্দার কাছে চলে আসে। ঘরে তো দেখা শোনার লোক নেই। একটি ননদ আছে; এই শহরেই তার শ্বশুর বাড়ি। তাই যখন তখন এসে বৌয়ের খুব শাস্তির ব্যবস্থা করে। এ সব কথা কালুর মা বিশেষ শব্দাবলী আর বিচিত্র ভাবভঙ্গির

সাহায্যে আমাকে স্কুল পর্যন্ত শোনাতে শোনাতে যেত। কিন্তু সে সময় এ সব কথার মূল্য আমার দিদিমার কাছে শোনা বেলারাণীর কাহিনীর চেয়ে বেশি চিত্তগ্রাহী ছিল না।

তবে এ কাহিনীর মধ্যে একটি সত্য ঘটনা আমাকে অশান্ত করে তুলত। রাজকুমারীর চোখ পুরান চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে বালিকাকে রোজ দেখত। কালুর মায়ের গল্প শুনে আর পর্দার ফুটোয় সেই চোখদুটি দেখে আমি বুঝলাম যে শোনা কাহিনীর সব রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, দৈত্য, দানব—এরা যদি এভাবে শ্রোতাটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে তবে গল্প শোনার সব সুখ চলে যায়।

চটের ফাঁকে দেখা সেই চোখদুটি আমার কল্পনার বিষয়ই হয়ে থাকত যদি দৈবাৎ এক দিন বৃষ্টি হওয়ায় কালুর মা বাড়িতে আটকা না পড়ত। আর আমিও বৃষ্টি থামতেই স্কুল থেকে যদি একা বেরিয়ে না পড়তাম আর রাস্তার কাদায় সেই চটের সামনেই আমার পা পিছলে না যেত যদি। বাচ্চারা পড়ে গিয়ে ব্যথা না পেলেও লজ্জায় অনেক সময় কেঁদে ফেলে। আমার কান্নারও বোধ হয় তাই কারণ ছিল। নয় তো ব্যথা পাবার কথা আমার মনে তো পড়ে না।

পর্দার আড়াল থেকে সেই চোখের অধিকারিণী কখন যে আমাকে টেনে উঠনে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। হঠাৎ বিস্ময়ে আমার কান্না থেমে গেল। একটি রোগা অথচ সুকুমারী বালিকার মত স্ত্রীলোক আঁচল দিয়ে আমার হাত আর কাপড় থেকে কাদা জল মুছে নিচ্ছিল আর ভিতরের দালান থেকে বৃদ্ধ শেঠ বিস্মিত স্বরে বলেছিলেন, 'আরে, এ তো বর্মা সাহেবের মেয়ে।'

সে দিন থেকে সেই বাড়িখানি আমার পক্ষে মস্ত আকর্ষণ হয়ে উঠল। অথচ সে ঘরে না ছিল একটি জানালা, না কোন চাকর-বাকর; না ছিল কোন অতিথি; না কোনো পশুপক্ষী। সেই সমাধির

মত ঘরে, লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ফুলের মত সেই কিশোরী বালিকা, কোনো সঙ্গী-সাথী ছাড়া, কোনো রকম আমোদ-প্রমোদ ছাড়া, যেন নিরন্তর বৃদ্ধা হবার সাধনায় লীন ছিল।

বৃদ্ধ দিনে এক বারই খেত। আর ও বেচারি তো বিধবা। দ্বিতীয় বার খেলেই প্রমাণ হবে, বিধবার সংযমপ্রধান জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে ওর মন বিপরীত দিকে যাচ্ছে।

প্রায়ই নিরাহার আর নিরন্তর মিতাহারে দুর্বল শরীর নিয়ে যে ও কি অসাধারণ পরিশ্রম করত সে আমার বালিকা-বুদ্ধিরও অগোচর ছিল না। ঘর আর লম্বা চওড়া উঠনখানি যেভাবে বসে বসে ও ঝাঁট দিত, শ্বশুরের আর নিজের স্নানের জল যে ভাবে থেমে থেমে কুয়ো থেকে তুলত, ধোপার অভাবে ময়লা কাপড়গুলি কাঠের মুগুর দিয়ে পিটিয়ে পরিষ্কার করত—দেখে আমার হাসি পেত। আবার শুধু উনুনের কাঠের আগুনেই একটু আলো-করা, দিনের বেলাও অন্ধকার, রান্নাঘরে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ধোঁয়ার মধ্যে থেকে যখন মাঝে মাঝে কাসির শব্দ আসত, খানিক ভেজা আর খানিক শুকন ছাই দিয়ে মেজে, শুকন কাপড়ে মুছে বাসনগুলোকে যখন রূপর মত চকচকে করে ফেলত (মাড়োয়ারে কেবল ব্যবহারের সময়ই বাসন জলে ধোয়া হয়) আর সেগুলো রাখার সময় শিথিল আঙুল থেকে পড়ে গিয়ে যখন ঝনঝন করে উঠত তখন আমার মন এক অজানা বিষাদে ভরে যেত।

কিন্তু কাজ যতই কঠিন হক, শরীর যতই ক্লান্ত হক, আমি কখনও ওর মুখে হাসির অভাব দেখি নি, অথবা ওর কোনো কাজ বন্ধ থাকতে দেখি নি। আর এত কাজ করা সত্ত্বেও যেন ওর দিনগুলি দ্রৌপদীর বস্ত্রের চেয়েও লম্বা ছিল। সকাল বেলা স্নান, তুলসী পূজা ইত্যাদিতে খানিকটা সময় কাটিয়ে ও অন্ধকার রান্নাঘরে চলে যেত। তারপর দশটা বাজতে বাজতে শ্বশুরকে খাইয়ে-দাইয়ে সেই চটের

পর্দার কাছে গিয়ে আমাকে সন্ধ্যা বেলা আসার নিমন্ত্রণ করে আসত। তারপরে রান্নাঘরের মাজাঘষা, কোটাপেষা হয়ে গেলেও দিনের প্রায় এক প্রহর অবশিষ্ট থাকে। দোকানের দিকে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে ও সেই অবসর সময়ে চটের পর্দার পাশেই কাটিয়ে দিত। সেখান থেকে কোনো কোনো বাড়ির পিছনের অংশ, আর রাস্তায় দু-একজন লোকের আসা-যাওয়া দেখতে পেত। আর এইটুকুই ওর চঞ্চলতার কথা ঘোষণা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ষোল বছরের সেই যুবতীর করুণ অবস্থা আজ বুঝতে পারছি। ওর জীবনের সোনা-মাখা স্বপ্ন দুর্দিনের বর্ষায় খেলা ঘরের মত যে কেবল ভেসে গেল তাই নয়, ওকে এতখানি একাকী ছেড়ে গেল যে, সে সব স্বপ্নের কথা কাউকে শোনানর সুযোগ পর্যন্ত ও পেল না।

এই অবস্থায় আট বছরের বালিকার ওপর ওর সঙ্গিহীন হৃদয়ের সমস্ত মমতা ও সঁপে দিয়েছিল। অথচ সে-বালিকা তো ওর স্বপ্নের সংসারে প্রবেশ করায় তখনও অসমর্থ। তাই সেই মেয়েটির পুতুলের সংসারকেই ও আপনার করে নিল। বৃদ্ধও নিজের পুত্রবধূর জন্য এ রকম নির্দোষ সাথী পেয়ে এতখানি প্রসন্ন হলেন যে নিজেই আদর-যত্ন করে আমাকে ডেকে আনতে আর বাড়ি পৌঁছতে যেতেন। আমার মা তো সেই মাতৃপিতৃহীন বিধবা বালিকার কথা শুনলেই মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছতে থাকতেন। তাই ধীরে ধীরে আমার বেঁটে পুতুলটি, আর বেডোল মাথাওয়ালা বর, এক পা খোঁড়া শাশুড়ি, বসতে অসমর্থ ননদ আর হাত দুটি ছাড়া অন্য সবরকমে আকারহীন দুটি বাচ্চা—সব এক এক করে বৌদির ঘরে গিয়ে উঠল। এ-টুকুই কেবল নয়—সেই পুতুলগুলোর আটা-পেষার জাঁতা থেকে শুরু করে গয়নাগাঁটি পর্যন্ত সব গৃহস্থালী, আর ডুলি থেকে রেলগাড়ি পর্যন্ত সব রকম যানবাহন সেই শূন্য গৃহে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।

বৌদিকে সব সময় দেখেছি, হয় শাদা ওড়না আর কালো ঘাগরা

পরে রয়েছে, নয় তো কালো ওড়না আর সাদা ঘাগরা পরে আছে। এ দিকে কিন্তু ওর ননদের জন্য প্রত্যেক উৎসবে খুব সুন্দর' সুন্দর রঙিন কাপড়-চোপড় তৈরি হত। আমার পুতুলদের লজ্জা-নিবারণের সুচারু ব্যবস্থা হত খানিকটা বৌদির টুকরো কাপড়ে, খানিকটা আমার ঘর থেকে আনা কাপড়ে। বৌদি ঘাগরা, কাঁচুলি ইত্যাদি সেলাই করতে জানত। তাই আমার মেয়ে পুতুলগুলিও মাড়োয়ারী সাজে সজ্জিত হত। আমি স্কুলে ঢিলা পায়জামা আর বাড়িতে কলিদার কুর্তা সেলাই করতে শিখেছিলাম। তাই ছেলে পুতুলদের পুরো ভদ্রলোক সাজিয়ে রাখতাম। চৌক কাপড়ের টুকুরোর মাঝখানটায় ফুটো করে বাচ্চাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতাম—তাই তাদের কোনো আদিম যুগের সন্তান বলে মনে হত।

বৌদি একেবারেই নিরক্ষর ছিল। তাই অতি সহজেই আমার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে যেত। আমি প্রায়ই নানা জন্তু-জানোয়ারের ইংরিজি নাম বলে আর ছবিওয়ালা বই থেকে ইংরিজি কবিতা খুব সুন্দর করে পড়ে ওকে অবাক করে দিতাম। তাছাড়া হিন্দি বই থেকে 'মায়ের প্রাণ', 'ভাইয়ের স্নেহ' ইত্যাদি কাহিনী শুনিয়ে ওর চোখ ছলছলে করে তুলতাম। আমি যে আমার মামাকে নিজের হাতে চিঠি লিখি সে কথা বলে বিকানীরের কাছে কোনো গাঁয়ে ওর যে পিসি ছিলেন তাঁর স্মৃতি ওর মনে জাগিয়ে দিতাম। ও প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত,—ঠিকানা যে জানি না, নয় তো তোমাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিতাম।'

সব চেয়ে কঠোর দিন আসত যখন বৃদ্ধ শেঠজির ভাগ্যবতী কন্যা বাপের বাড়ি এসে পড়ত। ও চলে যাবার পরও বৌদির রোগা ফর্সা হাতে লম্বা লম্বা কালো ছ্যাঁকার দাগ আর পায়ে নীল দাগ থেকে যেত। অথচ সে-সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলেই ও পুতুল সম্বন্ধে অন্য কোনো কথায় আমার মনটাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

সে-সময়ে স্কুলে সেলাইয়ের কাজ শিখে আমি ধানী রঙের সাড়িতে বড় বড় নীল ফুল সেলাই করে তুলতাম। রঙিন কাপড় বৌদির ভারি পছন্দ ছিল। তাই সেখানা দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে ও এ ভাবে চেয়ে রইল যেন কোনো সুন্দর ছবি দেখছে। আমি মায়ের কাছে চেয়ে চেয়ে কেন যে ঐ রকমই আরেকটা কাপড় জোগাড় করলাম আর কেন যে সেই ওড়নায় নীল রঙের ফুল করতে লাগলাম তার কারণ আজও আমি নিজে ভেবে পাই না। সে বেচারি বার বার ডেকে পাঠাত, নতুন নতুন পুতুলের কাপড় দেখাত। তবুও আমি বেশি ক্ষণ থাকতে পারতাম না বলে নিরাশভাবে আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত।

সে দিনের সব কথা আমার স্মৃতিতে যেন তপ্ত লোহার অক্ষরে লেখা রয়েছে। সেই ওড়নাখানা নিয়ে চুপি চুপি গিয়েছি, বৌদিকে অবাক করে দেব বলে। তখন বোধ হয় শ্রাবণের উৎসব চলছিল। কারণ মনে পড়ে সে দিন স্কুলে যাবার সাদাসিধে জামাকাপড়ের বদলে সুন্দর পাড়ওয়ালা শাড়ি পরেছিলাম। আর সকাল বেলা পড়ার কথা না বলে মা যে হাতে মেহেদি লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথাও মনে আছে।

বৌদি তখন দালানে বসে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে কিছু একটা বাছছিল। তাই পা টিপে টিপে গিয়ে ওড়নাখানা খুলে যখন ওর মাথার ওপর ফেলে দিলাম তখন ও ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসল। রঙিন জিনিস ওর বড় পছন্দ ছিল। তাই আমি পুতুল খেলা ছেড়ে একা একা বসে আমার ছোট হাতে অতবড় লম্বাচওড়া ওড়নাখানা ওর জন্য তৈরি করেছিলাম। ও যে ক্ষণেকের জন্য নিজের অবস্থার কথা ভুলে গেল তাতে আশ্চর্যের কি আছে? রঙিন বস্ত্র যে ওর পক্ষে বর্জিত তা ভুলে গিয়ে খেলনা পেয়ে প্রসন্ন বালিকার মত ওটা পরে আমার চিবুক ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হঠাৎ বিস্মিত স্বরে 'বীঁদনী' (বৌ) এই ডাক শুনে যখন ওর চেতনা ফিরে এল তখন দেখা গেল শ্বশুর হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য চৌকাঠ ধরে দাঁড়াচ্ছেন। আর খোলা তলোয়ারের চেয়েও কঠোর ননদ ক্রোধে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ করে ঘরে ঢুকছেন। অবশ্যই সেটা উৎসবের সময় ছিল। কারণ বৃদ্ধ সে দিন কন্যাকে আনতে নিজেই গিয়েছিলেন।

তারপর যা হল, সে তো স্মৃতির পক্ষেও অত্যধিক করুণ। ও রকম নিষ্ঠুরতা জীবনে আর কখনো দেখি নি। বাঁচাবার কোনো উপায় না দেখেই হয়তো আমি জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলাম। কিন্তু সে বেচারা শুধু মনের দিক থেকেই নয়, শরীরের দিক থেকেও যখন অচেতন হয়ে পড়ল, তখনই কেবল ছাড়া পেল।

বৃদ্ধ কি ভাবে আমাকে ঘরে পেঁাছে দিল, কত দিন জ্বরে পড়ে রইলাম—এ সব স্মৃতি তো এখন গভীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তবে অনেক দিন পরে যখন ওকে আবার দেখলাম তখন শিশুসুলভ চোখে বিষাদের গাঢ় রঙ লেগে গেছে। আর যে-ঠোঁট সর্বদা হাসিমাখা থাকত সেদুটি যেন কান্না চাপতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই একটি ঘটনায় বালিকা প্রৌঢ়া হয়ে গেল, যুবতী বৃদ্ধা হয়ে পড়ল।

তারপরে আমরা তো ইন্দোর থেকে চলে গেলাম। এক এক করে অনেক বছর কেটে যাবার পর আমি যখন ওর খোঁজ খবর নেবার যোগ্য হলাম তখন জানতে পারলাম সেই ছোট দোকানের জায়গায় এক বিশাল অট্টালিকা উঠে গেছে। বধূর রক্ষার ভার সংসারের ওপর ছেড়ে দিয়েই বৃদ্ধ সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কঠোর সংসার কিভাবে ওকে রক্ষা করছে, সে খবর আজও আমার অজ্ঞাত। এত বড় মানবসমুদ্রে সেই ছোট বুদ্বুদের স্থিতি কি রকম সে তো আমি জানি, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়

আমার শৈশবে যে নিজের জীবনের শূন্যতা ভুলে গিয়ে আমার খেলনার সংসার সাজিয়ে দিয়েছিল, তাকে যদি একবার পেতাম।

রঙিন কাপড়ের প্রতি আমার বিরাগ দেখে আজো যখন অনেকে কৌতুকভরা প্রশ্ন করেন, তখন সেই অতীত আবার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রঙিন কাপড়ে ঢাকা, যে-মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সে চেহারা কি করুণ, কি শুষ্ক! কখনো কখনো সেই মুখের আভাস—আমার সামনে যত করুণ ক্লান্ত মুখ আসে, তাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওদের সঙ্গে আমাকে এক অটুট বন্ধনে বেঁধে দেয়।

প্রায়ই ভাবি, বৃদ্ধ যখন চিরদিনের জন্য চোখ বুজলেন, তখন যাকে সংসারের দিকে তাকাবার অধিকার উনি কখনো দেন নি, তার কি দশা হল?

কি জানি কোন অনিষ্ট সম্ভাবনায় আমার সমস্ত মন আর্ত ক্রন্দন করে বলে ওঠে—'না—না।'

বিন্দা

রোগা, ছোট্ট, জড়সড় মেয়েটির ভীরু ভীরু চোখের দিকে তাকিয়েই আমি সামনে বসা ভদ্রলোককে প্রবেশপত্রখানি ফেরত দিয়ে বললাম, 'বয়সটা ঠিক লেখা হয় নি। এখনই ঠিক করে দিন। নয় তো পরে অসুবিধা হবে।' 'না, না, ওর যে গত আষাঢ়ে চোদ্দ পূর্ণ হয়ে গেছে'—শুনে আমি বিস্মিতভাবে আমার ভাবী বিদ্যার্থিনীর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। নয় বছরের বালিকার সরল চঞ্চলতাও ওর মধ্যে ছিল না, আবার চোদ্দ বছরের কিশোরীর সলজ্জ উৎসাহও ওর মধ্যে দেখলাম না।

ওর মায়ের সম্বন্ধেই কোনো প্রশ্ন হয়তো করে থাকব। কুণ্ঠিত-স্বরে উত্তর পেলাম, 'আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আছেন, আর আপনি তো জানেনই···।' তাঁর অর্ধসমাপ্ত কথা শুনেই আমার মন স্মৃতির চিত্রশালায় দু যুগেরও পুরান ধুলোয় চাপা-পড়া বিন্দা বা বিন্ধ্যেশ্বরীর অস্পষ্ট চিত্রের ওপর আঙুল রেখে বলে উঠল, 'জানি, জানি, অবশ্যই জানি।'

জীবন ও মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য ব্যবধান যখন বুঝতে পারি নি, বিন্দা আমার সেই সময়কার বাল্যসখী। আমার দাদামশাই আর ঠাকুরমা স্বর্গে গেছেন শুনে আমি গম্ভীর মুখ করে বাড়ির লোককে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলে দিলাম, 'আমার মাথা যখন কাপড়ের আলমারি ছোঁবে, তখন আমি নিশ্চয়ই এক বার তাঁদের দেখতে যাব।' আমার পুণ্য সংকল্পে বাধা দেবার ইচ্ছে তখন কারোই হয় নি। তাই আমি তখনও জানতে পারি নি যে, একবার মরলে মানুষ আর ফেরে না। ছোট ছোট অসমর্থ বাচ্ছাদের রেখে মা মরতে পারেন, সে কল্পনাই বা সে বয়সে আমার মনে আসবে কেমন করে? সংসার সম্বন্ধে

আমার অনুভূতিও তো তখন খুব সংক্ষিপ্ত। যে সাদা কুকুরটা একেবারে ছোট থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, সিঁড়ির নীচের অন্ধকার ঘরে দেখি ওর বাচ্চাগুলিকে ও সজাগভাবে পাহারা দেয়। ওর রাগের ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনে আমি আর ওদের সঙ্গে ভাব করতে যেতে সাহস পাই না। পাটকিলে রঙের বেড়ালটা ইঁদুরের মত অসহায় নিজের বাচ্চাগুলিকে নিজের তীক্ষ্ণ দাঁতের নীচে কি নরম করে চেপে ধরে! কই, কখনও তো ওদের গায়ে ওর দাঁত বিঁধে যাচ্ছে না। ওপরের ছাতের কোণায় পায়রার, আর বড় ছবিটার পিছনে চড়ুই পাখির যে বাসা রয়েছে, সেখানে ছোট ছোট খোলা ঠোঁটের ভিতরে যে কত সাবধানে খাবার ভরে দেওয়া হয়, তাও আমি অনেক বার দেখেছি। বাছুরটাকে একটু সরাতেই যে, শ্যামা গাই হাম্বা হাম্বা করে ব্যাকুলভাবে বাড়ির সকলকে এই দুঃখের কথা জানিয়ে দেয়, সে কথা আমার জানা ছিল। একটি শিশুকে কাঁধে নিয়ে আর একটির আঙুল ধরে যে ভিখারিণী দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, সেও তো বাচ্চাদের জন্যই ভিক্ষে করে। এ সব দেখে আমার মন ঠিকই বুঝে নিয়েছিল, সংসারে সমস্ত কাজকর্ম বাচ্চাদের খাওয়ান, পরান, শোয়ানর জন্যই হচ্ছে। আর এই বিরাট কর্তব্যে ভুল না হতে দেবার ভার মা-নামধারী জীবদের সঁপে দেওয়া হয়েছে।

আর বিন্দারও তো মা ছিলেন। তাঁকে আমরা 'বামুনখুড়ি' বলতাম, আর বিন্দা ডাকত 'নতুন-মা' বলে। তিনি তাঁর ফরসা মোটা দেহ রঙিন সাড়িতে সাজিয়ে চৌকিতে বসে মোহনের গায়ে তেল মাখাতেন। মোহনের গালদুটো ছিল ফোলা ফোলা, চ্যাপ্টা নাকের দু পাশে নীল কাঁচের বোতামের মত দুটি চোখ ঝকঝক করত। বামুনখুড়ি বেশ কায়দা করে পাটি পেড়ে চুল আঁচড়াতেন। তাঁর সিঁথির মাঝখানে লালকালির মোটা রেখার মত সিন্দূর, ঘুম-ঘুম চোখে চওড়া কাজল, ঝকঝকে কানের ফুল, গলার মালা, রঙ-

বেরঙের চুড়ি আর ঘুঙুর-দেওয়া পায়ের আঙুলের আঙটি ; এগুলো দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। কারণ এ সব গয়নায় সেজে তাঁকে আমার খেলাঘরের পুতুলগুলির মত দেখাত।

এসব তো ভালই ছিল। কিন্তু এক এক সময় তাঁর ব্যবহার বড় অদ্ভুত লাগত। শীতের দিনে রোদ ওঠার পরে আমাদের ঘুম থেকে ওঠান হত। গরম জলে মুখ হাত ধুইয়ে জুতো, মোজা আর পশমের পোষাক পরিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুধ খাওয়ান হত। তখন পাশের বাড়িতে বামুনখুড়ির গলার স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠত। সেই তর্জন গর্জনের অর্থ যদি কিছু না বুঝতাম তবে শ্যামার হাম্বারবের মত তাকে স্নেহপ্রদর্শনই মনে করতাম। কিন্তু তাঁর কথাগুলি পরিচিত ছিল বলেই কি রকম যেন সমস্যায় পড়ে যেতাম। 'উঠবি তো, না কি আসব ?' 'বলদের মত চোখ করছিস কেন ?' 'মোহনের দুধ আর কখন গরম হবে ?' 'অভাগী, মরে ও না'— ইত্যাদি বাক্যে যে কঠোরতার ধারা বয়ে যেত, তা আমার অবোধ মনও বুঝে নিত।

কখনো কখনো আমি যখন উপরের ছাতে গিয়ে ও বাড়ির কথা বুঝবার চেষ্টা করতাম, তখন ময়লা সাড়ি জড়ান বিন্দাকে উঠন থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত চরকির মত ঘুরতে দেখতাম। কখনো ঝাঁট দিচ্ছে, কখনো আগুন জ্বালছে, কখনো উঠনের কল থেকে কলসি ভরে জল তুলছে, কখনো নতুন-মাকে মোহনের দুধের বাটি দিয়ে আসছে। এ সব আমার চোখে বাজিকরের তামাশার মত লাগত। কারণ এ সমস্ত কাজ করা তো আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই বিস্ময়কর কৌতুক উপেক্ষা করে বামুনখুড়ির কঠোর স্বর আর তাঁর স্বামীর তর্জন যখন কানে যেত, তখন কেন জানি না, দুঃখে আমার মন ভরে যেত। যে সুশীল মেয়ের উদাহরণ দিয়ে আমার দুষ্টুমি বন্ধ করা হত, সেই বিন্দা ঘরে চুপিচুপি কি দুষ্টুমি করে, তা

আমি অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারি নি। আমি তো কখনো একটাও কাজ করতাম না, দিনরাত হৈ চৈ করতাম। কিন্তু মা তো কখনো আমাকে মরে যেতেও বলেন নি, চোখ বের করে নেবার ভয়ও দেখান নি। এক বার আমি মাকে জিজ্ঞেসও করলাম, 'বামুনিখুড়ি বুঝি তোমার মত, না?' মা কি বুঝলেন জানি না। বললেন, 'হাঁ'। তাতে বিন্দার সমস্যারও সমাধান হল না, আমার প্রশ্নেরও উত্তর পেলাম না।

বিন্দা আমার চেয়ে বোধ হয় খানিকটা বড়ই ছিল। কিন্তু এত বেঁটে ছিল, দেখে মনে হত ওপর থেকে চেপে কেউ ওকে ছোট করে দিয়েছে। ছু পয়সা দামের চামড়ার খঞ্জনির মত ওর পাতলা চামড়ার নীচ থেকে সবুজ শিরাগুলি দেখা যেত। রোগা রোগা হাতপাগুলি যেন কোন অজ্ঞাতভয়ে অবসন্ন ছিল। কোথাও কোনো শব্দ শুনলেই ও এমন চমকে উঠত, আর বামুনখুড়ির গলা শুনলেই এমন কেঁপে উঠত, তাতে আমার বিস্ময়ই যে শুধু বেড়ে যেত তাই নয়, আমি ভয়ও পেয়ে যেতাম। আর বিন্দার চোখছুটি দেখে আমার খাঁচার বন্ধ পাখির কথাই মনে হত।

একবার এক ছুই তিন করে তারা গুণতে গুণতে ও একটা ঝকঝকে তারার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল, 'ঐ, ঐটি আমার মা।' শুনে আমার এত আশ্চর্য লাগল, যার আর সীমা পরিসীমা নেই। তার মানে কি সকলের এক মা তারায় থাকেন, আর অন্য এক মা ঘরে থাকেন? বিন্দাকে জিজ্ঞেস করতেই তো নিজের জ্ঞানভাণ্ডারের কয়েক কণা ও আমাকে দিল। তখন বুঝলাম, যে-মাকে ঈশ্বর ডেকে নেন, তিনি তারা হয়ে ওপরে থেকে বাচ্ছাদের দেখেন। আর যিনি খুব সেজেগুজে বাড়িতে আসেন, তিনি বিন্দার নতুন মায়ের মত হন। আমার বুদ্ধি তো সহজে পরাজয় স্বীকার করত না। তাই আমি ভেবেচিন্তে বললাম, 'তুমি নতুন মাকে কেন

পুরান মা বলে ডাক না ? তাহলে তিনি আর নতুন মা থাকবেন না, তোমাকেও বকবেন না।'

বিন্দার কেন সে কথা পছন্দ হবে ? ও যে ওর পুরান মাকে খোলা পালকিতে শুয়ে আর নতুন মাকে বন্ধ পালকিতে বসে আসতে দেখেছে। তাই কাউকে পদচ্যুত করা ওর পক্ষে অসম্ভব।

এ দিকে ওর কথা শুনে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই সেই রাতে আমি মাকে খুব সাধাসাধি করে বললাম, 'ভগবান তোমাকে যতই ঝকমকে তারা করতে চান না কেন, তুমি কিন্তু মা তারা হয়ো না।' মা বেচারি কিছু বুঝে উঠতে না পেরে অবাক হয়ে রইলেন। আমি আবার বললাম, 'নইলে আবার বামুনখুড়ির মত নতুন মা পালকি চড়ে এসে যাবেন, আর তখন আমার দুধ, বিস্কুট, জিলিপি সব বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমারও বিন্দার মত অবস্থা হবে।' মা কি উত্তর দিয়েছিলেন মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে, সে রাতে ওঁর আঁচল মুঠোয় চেপে ধরে তবে ঘুমতে পেরেছিলাম।

বিন্দার অপরাধ কি তা জানতাম না। কিন্তু বামুনখুড়ির বিচারে যে সব শাস্তি ও পেত, সবই দেখেছি। গরমের দিনের দুপুর বেলা উঠনের জ্বলন্ত মাটিতে বার বার পা বদলে বদলে দিনভর খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। ক্ষিধেয় শুকন মুখ নিয়ে নতুন মা আর মোহনের ঘুমের পরে ওদের পাখার হাওয়া করেছে। শুধু অপরাধের জন্য নয়, অপরাধের অভাবের জন্যও ওকে শাস্তি পেতে হত। তাই খাবার থালায় বামুনখুড়ির কালো মোটা চুল পাওয়া গেলেও শাস্তি পেত বিন্দা। ওর তেলছাড়া খোলা নরম চুলের রঙ কটা ছিল বলে আমার খুব ভাল লাগত। বামুনখুড়ি যে দিন কাঁচি দিয়ে ওগুলো কেটে ফেললেন, দেখে আমার এত কান্না পেল! কিন্তু বিন্দা এভাবে বসে রইল যেন মাথা এবং চুল দুই-ই নতুন মায়ের।

অন্য এক দিনের কথা মনে পড়ছে। উনুনের দুধ উথলাচ্ছে দেখে বিন্দা ওর ছোট ছোট হাতে পাত্রটা উনুন থেকে নামাল বটে, কিন্তু হাত থেকে ফসকে গিয়ে সমস্তটা ওর পায়ে পড়ল।

ফুটন্ত দুধ পায়ে পড়ে ওর পা গেল পুড়ে। আমাদের বাড়ির দরজায় এসে ওকে কাঁদতে দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বামুনখুড়িকে বলে ও কেন ওষুধ লাগিয়ে নিচ্ছে না, তার কোনো কারণই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার ওপর বিন্দা আমার হাতখানা টেনে নিয়ে যখন ওর কম্পমান বুকের ওপর রাখল আর ওকে কোথাও লুকিয়ে ফেলতে বলল, তখন সমস্তটাই আমার কাছে আরো রহস্যময় হয়ে উঠল।

ওকে আমি তখনি ঘরে টেনে আনলাম। কিন্তু ওপরে মার কাছেও নিয়ে যেতে পারলাম না, লুকোবার জায়গা খুঁজতেও সময় পেলাম না। এমন সময় বামুনখুড়ি দৌড়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন, ওঁর গলার স্বরে তা বুঝতে পেরে ভয়ে আমার দিক ভুল হয়ে গেল। আমরা দু জনে তাড়াতাড়ি গরুর ঘাস রাখার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘাসের আগাগুলো আমার পায়ে বিঁধছিল, অন্ধকারে বড় কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু বিন্দা ওর পোড়া পাখানাকে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে, ঠাণ্ডা হাত দুখানা দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে, এমনভাবে বসে রইল যেন ঘাসের স্তূপ ওর কাছে রেশমের বিছানা বলে মনে হচ্ছে।

আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ ঘাস বের করার জন্য রাখাল ঢুকে যখন আমাদের দেখে চেঁচামেচি শুরু করল, আমি চোখ রগড়ে বলে উঠলাম, 'সকাল হয়ে গেল বুঝি?'

বিন্দার পায়ে তিল তেল আর চূণের জল লাগিয়ে মা যখন বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, তখন যে ওর কি দশা হল বলা কঠিন। কারণ

আমি তো জানি, বামুনখুড়ির ন্যায়বিচারে ক্ষমারও স্থান নেই, আপিলেরও অধিকার নেই।

একবার কয়েক দিন ধরে বিন্দাকে আর ঘরে উঠনে ছুটোছুটি করে কাজ করতে দেখি নি। ওর বাড়ি যেতে চাইলে মা বারণ করেছেন। অথচ নিজে আবার আঙুর আর আপেল নিয়ে প্রায়ই সেখান থেকে ঘুরে আসছেন। অনেক খোশামোদ করার পর রুকিয়া বলল, ও বাড়িতে মহারানী এসেছেন।

'তা, তিনি কি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?' বলতেই ও মুখে কাপড় গুঁজে হাসি চাপতে লাগল।

আমার মন শান্ত না হওয়াতে এক দিন দুপুরে লুকিয়ে লুকিয়ে বিন্দাদের বাড়ি গেলাম। নীচের নিস্তব্ধ ঘরে বিন্দা একা একখানা খাটে শুয়ে আছে। চোখ বসে গেছে, সমস্ত মুখ গুটিতে ভরে গেছে আর ময়লা চাদরের নীচে ঢাকা শরীর বিছানার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। ডাক্তার, ওষুধের শিশি, মাথায় হাত বোলাচ্ছেন মা, বিছানার চারদিকে বাবা ঘুরছেন, এ সব ছাড়া যে রোগের অস্তিত্ব থাকতে পারে তা তো আমি জানতামই না। তাই বিন্দার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। খানিক সঙ্কেতে, খানিক অস্পষ্ট শব্দে বিন্দা বলল, 'বোধ হয়, বসন্ত হবার ভয়ে নতুন মা মোহনকে নিয়ে ওপরে থাকেন।' সকাল-সন্ধ্যা ঝি এসে, ওর কাজ করে দিয়ে যায়।

আর তো কখনো বিন্দাকে দেখতে পাই নি। কারণ সে দিন এভাবে আদেশ অমান্য করায় মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

এক দিন সকালে রুকিয়া যেন মাকে কি বলল। মা রামায়ণ বন্ধ করে চোখ মুছতে মুছতে বিন্দাদের বাড়ির দিকে গেলেন। যেতে যেতেও আমাকে বাড়ি থেকে না বেরবার আদেশ দিতে ভোলেন নি। তাই এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে হল।

রুকিয়া তো আমার চোখে ত্রিকালদর্শীর কম ছিল না। কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় ছাড়া ও তো কিছু বলত না। তাতে আবার আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগত। তাই জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বিন্দাদের বাড়ির দরজায় অনেক লোক জমা হয়েছে। তার বেশি কিছুই আর দেখতে পাই নি। ভিড়ের সঙ্গে বিয়েরই কেবল সম্পর্ক আছে জানি।

তাই ভাবলাম, বাড়িতে নিশ্চয় কারও বিয়ে হচ্ছে। এই বামুনখুড়ি মরে তারা হয়ে গেলে তবে তো বিন্দার বাবা আবার বিয়ে করবেন। আর মোহন তো এখনও বসতেই শেখে নি। তবে বিন্দা ছাড়া আর কার বিয়ে হবে ?

আশ্চর্য, ও আমাকে এক বার ডাকলও না! এই অচিন্তনীয় অপমানে আহত হয়ে আমার খেলার সব পুতুলগুলিকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম, বিন্দাকে আর কোনো শুভকার্যে ডাকব না।

অনেক দিন উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে অবশেষে এক দিন মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিন্দা শ্বশুরবাড়ি থেকে কখন আসবে ?'

তখনই জানলাম ও ওর আকাশবাসিনী মায়ের কাছে চলে গেছে। সে দিন থেকে আমি ঝকমকে তারার আশে-পাশে ছোট তারাগুলির মধ্যে বিন্দাকে খুঁজতাম। কিন্তু এতদূর থেকে কি চিনে নেওয়া সম্ভব ?

তার পরে কত কাল তো কেটে গেল। কিন্তু বিন্দা আর ওর নতুন-মায়ের কাহিনী কি শেষ হয়েছে ? কখনও হবে কি না তাই বা কে জানে !

সাবিয়া

সাবিয়া হল পৌরাণিক সাবিত্রী নামেরই অপভ্রংশ।

আমি চাকর বদলাই না, সম্ভবতঃ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার জন্যই বুড়ো জমাদার আমার আদেশ না নিয়ে মহাযাত্রায় চলে গেল। সেখান থেকে তো আর কাউকে ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই এক দিন এক মাসের মাংস পিণ্ডটিকে কাপড়ে জড়িয়ে আর পাঁচ বছরের কালো মেয়ে বাচিয়ার হাত ধরে সাবিয়া আমার সামনে এসে উপস্থিত হল।

ওর মুখখানি দেখে মনে হচ্ছিল যেন চকচকে কালো মাটি দিয়ে তৈরি। অথচ প্যারিস প্লাস্টারে গড়া মূর্তির মত তার প্রত্যেকটি রেখায় চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। চোখের গড়ন লম্বা না হয়ে গোল হওয়াতে মেলায় হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার মত একটি ভীতচকিত দৃষ্টি তাতে ছিল। হাতে পায়ে মোটা মোটা গিল্টি করা বালা আর মল দেখে জেলের কয়েদিদের কথা মনে আসছিল। ছোট কপালে জোড়া ভুরুর ওপরে হলদে কাঁচের টিকলিতেই মাত্র একটুখানি ওর প্রসাধন। সাড়িখানা কোন এক সময়ে লাল রঙেরই ছিল, অথচ এখন সেখানা পুরন ঘড়ার রঙে পরিণত হয়েছে। সেই সাড়ি জড়ান দেহটি দেখলে মনে হয় কোনো অপটু শিল্পীর হাতের সযত্নে গড়া মাটির মূর্তির সব কাঁচা রঙ ধুয়ে গিয়ে এখন ফাঁকে ফাঁকে রেখাগুলিতে বাঁধা মাটিই দেখা যাচ্ছে কেবল।

শুনলাম ওর স্বামী ওকে না জানিয়ে বিদেশে চলে গেছে। ও তখন আঁতুড়ে ছিল। মনের দুঃখে বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাই যে বাড়িতে আগে কাজ করত, তারা নতুন মেথরাণী লাগিয়ে নিয়েছে। এখন যদি আমার কাছে কাজ পেয়ে যায় তবেই বাচ্ছাদের মানুষ করতে পারবে।

আমার এখানে ও প্রাণপণে কাজ করবে এ রকম আশ্বাস, উপেক্ষা করে সেই পুঁটুলিটার দিকে সন্দেহ ভরা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এটিকে নিয়ে কি করে কাজ করবে?' সাবিয়া যখন সেই কালো রোগা মেয়েটির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ভাই-এর দেখাশোনার কাজে ওর অসাধারণ পটুতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে লাগল তখন আমি জোরে হাসতে না পারলেও একটুখানি মুচকে হাসি চাপতে পারিনি।

বাস্তবিকই বাচিয়ার জোনাকি পোকার মতো চোখের ওপর গাম্ভীর্যের অন্ধকার দেখে সে কথায় হেসে ওঠা নিষ্ঠুরতা হবে মনে হচ্ছিল। আর একেবারে চুপ করে থাকাও তো যায় না।

ওকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যখন আমি বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে এলাম তখন বুড়ি ভক্তিন মনের কৌতূহল চাপতে না পেরে ওকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। ওর হাজারো প্রশ্নের মধ্যে কিছু কিছু বিনা চেষ্টায় আমার কানে এসে ঢুকছিল।

সাবিয়ার পতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তো স্পষ্ট শুনতে পাইনি। কিন্তু উত্তরে, 'না মা, ও আমার বিয়ে করা স্বামীই বটে,'—বলার সময়ে ওর গলা ভার হয়ে উঠল। 'ও মেয়েমানুষটি তো ভারি বজ্জাত' এর উত্তরে সাবিয়া ক্লান্ত স্বরে বলল, 'তা কি হবে। আপন ভাল জগৎ বোঝে।' আবার আমি চেষ্টা করে লেখায় মন দিলাম, আর কথার সূত্র ওখানেই ছিঁড়ে গেল। বুঝলাম যে সাবিয়ার স্বামী সত্যবানের অপভ্রংশ তো মোটেই নয়, এমন কি ওর ওই অর্থহীন মেকু নামটির মতো নিরর্থকও হতে পারেনি। একদিন নিজের জাত-ভাইয়ের নতুন বৌকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না—আবার সেও এমন সময়ে যখন সাবিয়া তিন দিনের শিশু নিয়ে আঁতুড়ে রয়েছে। তখন থেকে সাবিয়া ওর আশাও ছাড়েনি, অথচ ওর কোনো খবরও পায়নি। বেচারা জাতভাই সাবিয়ার কাছে খালি ঘর বসিয়ে নেবার

যে প্রস্তাব করল, তাতে সে স্বীকৃত হল না। অবশেষে এক বুড়ি বিধবা বৌদিকে নিজের ঘরের লক্ষ্মী করে তাকে নিশ্চিন্ত হতে হল।

সকাল বেলা নিমতলায় কাঁকর ভরা মাটির ওপর একখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পেতে ও বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিত, আর মাছি-মশা তাড়ান আর বাচ্চাটির ওপর চোখ রাখার জন্য বাচিয়াকে বসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া গামছা কোমরে বেঁধে ঝাঁট দিতে লেগে যেত। উঠনের এক ধারে ঝাড়ুর ছরছর সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় সাবিয়ার নৃত্য শুরু হত, আর অন্যধারে কখনও বীরাসনে, কখনও যোগাসনে বসে ছোট ছোট হাতে মাছি তাড়াতে, আর কখনও এক পায়ে, কখনও দুই পায়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কাক তাড়াতে দেখা যেত বাচিয়াকে।

মায়ের রোগা শরীরে শুকনো লকড়ির কাঠিন্য না থেকে সবুজ ডালের নমনীয়তা ছিল, যাতে দুর্বলতার চেয়ে প্রাণের পরিচয়ই বেশি পাওয়া যেত। আর মেয়ের শুষ্ক দেহে নতুন পাতার চঞ্চলতা না থেকে কুঁড়ি থেকে ফুটে বেরতে পারছে না এ রকম কিশলয় কোরকেরই বেশি সাদৃশ্য ছিল।

আমার জানালার সামনের নিমগাছ ছিল বাচিয়ার রঙ্গমঞ্চ, আর তার দর্শক ছিল আমার ঘরের পুষি, পরদেশী কাক, নাম-না-জানা পাখি, তাদের নিমগাছবাসী পড়শি গিরগিটি—এরা সব। কিন্তু বাচিয়ার অতিরিক্ত সতর্কতা দেখে মনে হত কুকুর থেকে পাখি, আর গিরগিটি থেকে মাছি পর্যন্ত সবাই যেন ওর আদরের ভাইকে নিয়ে পালাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। কখনও কখনও এসব ছদ্মবেশী ডাকাতদের ভোলাবার জন্য ও বেড়ালের ম্যাও ম্যাও থেকে শুরু করে পাখির চিঁ চিঁ পর্যন্ত সব রকম ভাষায় কথা বলে যেত। আর সব শেষে সন্ধির শঙ্খনাদের মতো ওর এক পয়সা দামের বাঁশিটি বাজিয়ে ওদের শুনিয়ে দিত।

ওর কর্তব্যপরায়ণতার দুর্গ ভেদ করে যখন ক্ষিধে ওর শরীরে

প্রবেশ করত তখন ময়লা কাপড়ের কোনায় বাঁধা রুটির টুকরো খুলে সে সব গুপ্ত শত্রুদের সঙ্গে চুক্তি শুরু করত। কিন্তু এ তো মানতেই হবে যে এতগুলি দর্শকের উপস্থিতিতে সে কাজ করা কঠিন হয়ে উঠত। একবার যখন মোরগের স্বর অনুকরণ করে কিছু খাবার দেবার উপক্রম করেছে, তখনই বিদ্রোহী কাক ওর ক্ষিধের সঙ্গে লড়বার একমাত্র অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। শেষে আমি বিস্কুট আর একটি বেশমের লাড্ডু পাঠিয়ে দিলাম। তখন থেকে বাচিয়ার যাচনা 'কুকড়ু-কু' রূপে এসে আমার কাছে পৌঁছত, আর তার উত্তরে আমি যা পাঠাতাম, তাতে ভক্তিনের বিরক্তিও বেড়ে যেত।

দশটার মধ্যে সব কাজ সেরে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে সাবিয়া স্নান করতে চলে যেত। তারপরে ওর ঘষে ঘষে মাজা পিতলের ঝকঝকে থালা নিয়ে যখন ও খাবার নিতে আসত, ততক্ষণে ছাত্রাবাসের খাবার পাট চুকে যেত। ছাত্রীদের থালার এঁটো জড় করে জমাদারকে না দিয়ে সেগুলো স্কুলের গাড়ির বলদদের খাওয়াতে আমি যে কঠোর আদেশ দিয়েছিলাম, তার ফলে রান্নাঘরের থেকে পাওয়া ডালভাতের সঙ্গে সাবিয়াকে রাঁধুনী-ভারী এদের অনেক তিক্তব্যঙ্গও যে সহ্য করতে হত তা আমি অনুমান করেছিলাম। কিন্তু সাবিয়া তো কখনও কারও নামে কোনো নালিস করত না।

সকাল-সন্ধ্যা বাচ্চাদের নিয়ে সাবিয়া বড় কষ্ট করে থালা নিয়ে যায় দেখে এক দিন ওকে বললাম, ওখানেই বাচ্চাদের খাইয়ে যেন ও খেয়ে নেয়। ও খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'মা, বাচিয়ার যে এক অন্ধ ঠাকুর মা আছে, তাকে না খাইয়ে-দাইয়ে কি করে খাই?' এর পরে তো কিছু বলা যায় না। কিন্তু রোগা, দুর্বল স্ত্রীর ওপর দুটি বাচ্চা ও অন্ধ মায়ের ভার সঁপে দিয়ে যে মেকু চলে গেল, তার প্রতি আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

সাবিয়ার এই সুন্দর স্বভাবের জন্য ওকে আমি খুব স্নেহ করতাম, তাই আমার এখানে ও বেশ ভালই ছিল।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন ভক্তিন সাবিয়ার দোভাষী হয়ে এসে বলল, ওর একখানা শাড়ি চাই। আলনায় ঝোলানো আমার খদ্দরের শাড়িখানাই নিয়ে যেতে বললাম। ভক্তিন কিন্তু মুখ গোমড়া করে বলল, 'আরও ভালো কিছু নেই ?' তখন অগত্যা উঠে গিয়ে পুরনো কাপড় ঘাঁটতে বসলাম।

রেশমি শাড়ি পরা যখন ছাড়িনি, তখনকার রঙ ওঠা নীল শাড়ি একখানা ছিল। সেখানাই ভক্তিনের সামনে ফেলে দিয়ে আবার কাজে মন দিলাম। কেউ নিজে কিছু না বললে তার সম্বন্ধে কিছু জানার ইচ্ছেই আমার হয় না। তাই এই অসময়ে শাড়ি চাওয়া নিয়ে আমি কিছুই বলিনি। অথচ আমার স্বভাবের এই অভাব পূর্ণ না করে ভক্তিন বাঁচতেই পারত না। আমার কাছে ও সব সময় সঞ্জয়ের ভূমিকা গ্রহণ করত। তফাৎ ছিল কেবল এই, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাইলে তবে সঞ্জয় যুদ্ধের খবর দিয়ে তাঁকে দৃষ্টির সুখদান করতেন। আর এ দিকে ভক্তিনের কাছে জানতে চাই এমন সব সংসার-কথা না শোনার জন্য আমাকে প্রায়ই বধিরতার ভান করার দুঃখ পেতে হত।

ভক্তিনের কাছে শুনলাম, গেঁদাকে নিয়ে মেকু ফিরেছে ; কিন্তু স্টেশনের কোনো জমাদারের বাড়িতে ওকে রেখে এসেছে। বেচারি সাবিয়া আনন্দে পাগল হয়ে সে দিনেই সত্যনারায়ণ-পূজার ব্যবস্থার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। সব যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন মেকু মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল ! অনেকবার প্রশ্ন করার পর গেঁদার খবর দিয়ে ওকে ডেকে আনার জন্য সাবিয়াকে খোশামোদ করতে লাগল। এইই শুধু নয়, সাবিয়ার পরনে রেশমি শাড়ি দেখে বলল, 'এ শাড়ি তো তোর কালো রঙে মানাচ্ছে না সাবিয়া। গেঁদাকে এটা দিয়ে দে, ওকে খুব মানাবে।'

সাবিয়া একটা কথা না বলে, সেই নীল শাড়ি খুলে মেকুর হাতে দিল। আর নিজে পুরনো শাড়ি পরে, অন্ধ শাশুড়ি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও গেঁদাকে ঘরে আনার জন্য চলে গেল। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, এই আঘাতে ওর মন ভেঙে গেছে। কারণ ও এক-একবার নিমগাছে মাথা ঠেকিয়ে কেঁদে নিচ্ছিল। কখনও বা ঝাঁট দিতে দিতে চোখ মুছছিলো। বেচারি কতদিন ধরে স্বামীর পথ চেয়েছিল। আজ মেকু এল তো এল গেঁদাকে নিয়ে। তার ওপর সাবিয়ার সুখ-দুঃখের একবার খোঁজ পর্যন্ত নিল না, বাচ্চাগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না।

হঠাৎ একদিন সাবিয়া শামলা রঙ আর গোল মুখওয়ালা ধৃষ্ট, চঞ্চল গেঁদাকে সেই নীল শাড়িখানা পরিয়ে নিয়ে এল। বলল, 'ছুটকি তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে মা।'

ভালই হল ; এখন আমি কি বলে আশীর্বাদ করি ? সুখী হও, বলার অর্থ হবে শাবিয়াকে এভাবে কষ্ট দিতে থাক। তাই আমি বললাম, 'ঈশ্বর এমন সুবুদ্ধি দিন যেন তোমরা মিলে-মিশে থাকতে পার।'

এর চার-পাঁচদিন পরে আবার সাবিয়া এসে উপস্থিত হল। ওকে ওর পাঁচ মাসের মাইনে পঞ্চাশ টাকা এখনই দিতে হবে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম, গেঁদার আগের স্বামীর জাত ভাইরা বিরক্ত করছে, পঞ্চায়েতকে খাওয়াতে হবে।

এই মহৎ কার্যের জন্য সাবিয়ার শিশুগুলোকে উপোস করিয়ে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না। তবু কিছু টাকা তো দিতে হল। পরে যখন জানলাম যে, বাকি টাকার জন্য সাবিয়াকে তার মায়ের শেষ স্মৃতি-চিহ্ন পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে, তখন মনে অনুতাপ এল।

গেঁদার ও বাড়িতে সব সময় থাকার ব্যবস্থা হবার পরও সাবিয়ার কষ্ট কমল না। দু'বেলা থালায় ভাত-রুটি, আর ঘটি ভরে ডাল নিয়ে যেতে ওকে দেখতাম। অবুঝ বাচ্চাদের উৎপাত ও যে ভাবে সহ্য

করে, ঠিক সেই ভাবে ওর স্বামীর হৃদয়হীন কৃতঘ্নতা, সপত্নীর অনুচিত ব্যঙ্গ, শাশুড়ির অকারণ ভর্ৎসনা—সবই অগ্রাহ্য করে। কিছু বল্‌লে বলে, 'ধর, আমার স্বামী যদি পাগল হত কি পীড়িত হত, তাহলে লোকে আমায় কি করার পরামর্শ দিত?'

ওতো সব রকমে নিকৃষ্টতম প্রাণী। তবু ওর মধ্যে যে এই পরশ-মণির অবস্থিতি, যা সব লোহাকে সোনা করে দেয়—তা কি করে সম্ভব ভেবে পাই না।

এত বছরের মধ্যে আমি কেবল একটি দিন সাবিয়ার মধ্যে হতাশার ভাব দেখেছিলাম। মেকু আর গেঁদা কোনো এক গাঁয়ে মেলা দেখতে গিয়ে আর ফেরেনি। ঠিক সেই সময়ে ওদের পাশের বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। ধরা পড়ার ভয়ে মৃতপ্রায় সাবিয়া যখন আমার সামনে এসে বলল, 'এবার আমি আর বাঁচব না, মা—।' আর চুপচাপ চোখের জল ফেলতে লাগল, তখন ওর কষ্ট দেখে মনে ভারি দুঃখ হল।

সাবিয়ার এই বিপদ কোনো মতে কাটানো গেল। এই সলজ্জ আর কর্তব্যনিষ্ঠ সাবিয়াকে লক্ষ্য করে যখন এক পরিচিত উকিল-পত্নী বললেন, আপনি চোরের বৌকে কেন চাকরি দিয়েছেন? —তখন আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'অন্যের ধন কোনো প্রকারে নিজের করে নেওয়াকে যদি চুরি বলা হয়, তবে আমি জানি না আমাদের মধ্যে কোন সম্পন্ন মহিলাকে চোর-পত্নী বলা না যায়!' প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের কালিমা দেখে আমার মনে একটু কষ্ট হল, অথচ ততক্ষণে তীর ছুটে গেছে, আর বিদ্ধও হয়ে গেছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সাবিয়াকে আমি সেই পৌরাণিক নারীর সমস্তরের মনে করি, যিনি জীবনের সীমারেখা কোনো এক অজ্ঞাতলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে যদি জীবনের জন্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুঝতে হয়, তো একে না মরার জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

বিদ্রো

মল্লীতালের বাজার থেকে কুলমণি তখনও ফিরে আসছে না। এদিকে ঝিলের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে বসে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। পাতার ঝালরশুদ্ধ গাছের ডালগুলির যে ছায়া জলে পড়েছে, তার সঙ্গে প্রাণায়াম করতে করতে আমার দৃষ্টিও তখন ক্লান্ত।

এমন সময় হঠাৎ 'আরে, এ যে মহাদেবী', শুনে যখন রাস্তার দিকে তাকালাম, তখন স্যাণ্ডেলের দুটি সরু উঁচু গোড়ালির ওপর আপন স্থূল দেহের ভার সামলানোর ভঙ্গিতে আমার একটি পুরনো বন্ধু বিচিত্র ব্যায়ামের মুদ্রায় সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার যখন আমাকে পাহাড়ে গিয়ে থাকতে বললেন, তখন নৈনিতালের কোলাহল থেকে তিন মাইল দূরে তাকুলায় থাকার অনুমতি চেয়ে নিলাম। সপ্তাহে একবার ডাক্তারের পরামর্শের জন্য নৈনিতাল যেতে হত। চাকর যতক্ষণ দরকারি জিনিসপত্র কিনে ফিরে না আসত ততক্ষণ ঝিলের বাঁদিককার একটি নিস্তব্ধ কোণে বসে আমাকে অপেক্ষা করতে হত।

সে দিন আমার বাল্যসখীকে পেয়ে সত্যিই আমার আনন্দ হয়েছিল। ও নিজের দুটি বাচ্চা নিয়ে উপরে যে বাংলোয় থাকত, সেখানে না যাবার জন্য কোনো অজুহাত খোঁজবার ইচ্ছাই হল না।

অতীতের ফিকে স্মৃতিকে রঙ দিতে দিতে সঙ্গী এক পরিচিত বৃদ্ধ সজ্জনের সম্বন্ধে বললেন যে, তিনি তাঁর তৃতীয়া নবোঢ়া পত্নীকে নৈনিতাল দেখাতে নিয়ে এসেছেন। আমার দুই চোখের বিস্ময় যে শব্দে ফুটে বেরোয়নি, সে কেবল তার পরিমাণ বাহুল্যের জন্য। বৃদ্ধ

কম পক্ষে জীবনের চুয়ান্নটি বসন্ত পার করেছেন। দুটি অর্ধাঙ্গিনী বোধহয় তাঁর জীবনের দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি বলেই তাঁর সঙ্গ ছেড়ে গেছেন। তাঁদের কাছ থেকে উপহার-স্বরূপ পাওয়া দুটি পুত্রের মধ্যে একটি কলকাতায় কোনো ব্যবসা করেন; অন্যটি শ্বশুরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। দুখানি বাড়ি আর কিছু টাকা-পয়সা আছে, তার থেকে বানপ্রস্থ আশ্রমকে কিছু সরস করে তুলবার জন্য বৃদ্ধ মহোদয় এক সঙ্গিনী খুঁজে বের করেছেন। আমার নীরব জিজ্ঞাসায় প্রভাবিত হয়ে সখী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ভয় পেয়ো না; এবার উনি পঁয়ত্রিশ বছরের এক বাল্য-বিধবাকে উদ্ধার করেছেন।

আমার 'অসম্ভব' শব্দটির মধ্যে যতখানি অবিশ্বাস ছিল, ততখানি ব্যঙ্গ ঠোঁটে ভরে নিয়ে ও হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদবিবাদের পর ঠিক হল যে, ফেরার পথে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে।

মল্লীতালে এক দোকানের উপরের দুখানি ঘর নিয়ে বৃদ্ধ সপত্নীক বাস করছিলেন। দরজায় খটখট আওয়াজ করতে যে স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধ মহোদয়ের অনুপস্থিতি জানিয়ে বড় বিনীত ভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে দেখে রুগ্ন বলে মনে হল। নতুন সোনার হারটি ওই রোগা হাড়-জিরজিরে গলায় মোটে মানায়নি। পুরনো ইয়ারিং দুটিও কানে সমান বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। চোখ দুটি যদিও বড় বড়, তবুও মনে হচ্ছে যেন পলক ফেলতেই বেরিয়ে আসবে। নীচের পাটির সামনের দুটি দাঁতের একটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য, অন্যটির অর্ধেক দেখা যাচ্ছে।

পঁয়ত্রিশ বছরের দীর্ঘ বৈধব্য পার করে দিয়ে তিনকাল পেরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ বরের জন্য যে স্বয়ংবরা হয়েছে, সে আবার চোখের সামনে একটি সাকার বিস্ময়রূপে এসে দাঁড়াল। তসরের ময়লা শাড়িতে জড়ান সেই সঙ্কুচিত মূর্তিতে না ছিল রূপ, না স্বাস্থ্য। কোনও আনন্দ

বা উল্লাসের ছায়াও তার মধ্যে দেখিনি। তবে কি নিয়ে সে এই নতুন সংসার পাততে যাচ্ছে, এই প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করল।

'সেই প্রথম সাক্ষাৎ যদি শেষই থেকে যেত তবে বলার আর কিছু থাকত না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখি, রুমালে খোবানি বেঁধে নিয়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফিরছেন। এক-এক শ্বাসে অনেক অনেকবার নিমন্ত্রণ করে তিনি তাঁর নবাগতা পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করাতে বাধ্য করলেন। এভাবে সেই অশেষ সৌভাগ্যবতীর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে পেরেছিলাম।

চার ভাই-বোনের মধ্যে একা বোন হওয়ায় ও খুব বেশি আদরের মধ্যে বড় হয়েছিল। বিবাহ যখন হল তখনও অবোধ ছিল। আর বৈধব্যের কথাও ওর এখন মনে নেই। বিবাহের বছরই পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোক বধূর নাম মুখেও আনল না। দুর্দৈবের এই আঘাত সহ্য করার জন্য ব্যাকুল মা-বাপ সমস্ত স্নেহ উজাড় করে ওর ওপর ঢাললেন। ওকে কোনো অভাবই বোধ করতেই দিলেন না। এভাবে অভিশপ্ত হয়েও শাপ সম্বন্ধে অজ্ঞ কোনো পরীর দেশের রাজকন্যার মতো মেয়েটি নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ হয়ে বাড়তে লাগল।

তারপর মা যখন পরলোকে গমন করলেন, তখনও বাবা বেঁচে থাকাতে ওর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না। কিন্তু বাবা চোখ বুজতেই সংসারের সমস্ত বস্তুর মূল্য বদলে গেল।

এতদিন পর্যন্ত স্বামী ওর কাছে ঈশ্বরের মতোই ছিলেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য হয়েও আমাদের হৃদয়ের অচল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আধার হয়েই থাকেন। ভাবুক উপাসকের মতো এক সুখময় সাধনায় ও নিজেকে লীন করেছিল।

প্রথম প্রথম বৌদিরা যখন পতির মৃত্যুর জন্য ওকেই দোষী মনে করল আর পড়শিরা ওর কোনো অজ্ঞাত অভাব লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ

করতে শুরু করল, তখন ওর হৃদয় দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে এমনি চমকে উঠল যেন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি গায়ে অঙ্গারের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠেছে।

তখন থেকেই ওর জন্য নিত্য নূতন মানসিক আর শারীরিক যন্ত্রণার আবিষ্কার হতে লাগল। ঘরের চাকর-বাকর কমিয়ে দিয়ে প্রথম প্রথম সঙ্কেতে, পরে স্পষ্টরূপে আর অবশেষে আজ্ঞার স্বরে সব কাজ ওকে দিয়ে করানো চলতে লাগল। অনভ্যাসে কাজে ভুল হলে বৌদিরা রেহাই দিত না। ওরা বলত, 'ভাইরা সত্যযুগের লোক, তাই এই অকর্মাকে বসিয়ে খাওয়ায়।' এ রকম স্বরে কথা শোনা ওর পক্ষে একেবারেই নতুন। ও তো বুঝতেই পারত না, যে ঘরে ওর জন্ম আর লালন-পালন হল, সেখানেই রাতদিন কাজ করে নিজেরই সহোদরদের কাছ থেকে খাওয়া-পরা পাবার জন্য ওকে কেন এতখানি কৃতজ্ঞ হতে হবে। ভাইদের মধ্যে কেবল বড়ই চাকরি করত, অন্য দুজন তো জায়গা-জমি দেখাশোনা করত, যা ওরও বাবারই সম্পত্তি।

ধীরে ধীরে সেই বিষাক্ত আবহাওয়ায় ওর শরীর খারাপ হতে লাগল, মনও ভেঙে গেল। জ্বর হতে লাগল। কেউ বলল, ক্ষয়-রোগের পূর্ব লক্ষণ, কেউ বা বলল, মৃগীরোগ।

রোগ দুটিই সংক্রামক। বেচারি বৌদিরা আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। পরামর্শ করে ছোট ভাইকে দিয়ে ওর দেওরের কাছে চিঠি লেখাল। সেখান থেকে উত্তর এল, ওরা ওকে চেনেই না।

নিরুপায় হয়ে বড় বৌদি স্নেহসিক্ত স্বরে নিজের স্বামীকে গিয়ে বলল, 'এখন তো বিধবাদের বিয়ে হচ্ছে। বেচারি বিট্টোর যদি বিয়ে দেওয়া যায় তো কেমন হয়?' ভাই যখন বোনের ইচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, তখন বৌদি মমতাভরা স্বরে বলল, 'এ রকম ইচ্ছা তো কোনো নির্লজ্জ মেয়েও প্রকাশ করে না, আর বিট্টো তো লজ্জার

প্রতিমূর্তি। কিন্তু বিয়ে না হলে এ রকম তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে ও মরে যাবে।'

যে সমাজে চৌষট্টি বছরের পুরুষ চোদ্দ বছরের পত্নী চায় সেখানে বত্রিশ বছরের বিট্টোর পুনর্বিবাহের সমস্যা তো খুবই সহজ। ওর ভাগ্যে দেড়শো বছরের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাওয়া গেল না, আর ওর জন্ম-জন্মান্তরের অখণ্ড পুণ্যফলে আমাদের পরিচিত এই চুয়ান্ন বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওকে উদ্ধার করলেন।

বৌদি যখন ওকে এই আনন্দের খবর দিল, তখন প্রথম তো এই সত্য ওর বড় বড় চোখের শূন্য দৃষ্টি ভেদ করে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছতেই পারল না। অনেক কষ্টে যখন পৌঁছল, পরিণাম হল বিপরীত। অনেক কান্নাকাটি করে ও বিয়ের ব্যাপারে বাধা দিল। কিন্তু পরোপকারীর পথ সমুদ্রও আটকাতে পারে না, পর্বতও নয়।

তখন কেউ ওকে ভাই-ভাইপোদের কল্যাণ চিন্তা করতে বলল। কেউ রোগের সংক্রামকতার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আবার কেউ বা ওর রুগ্ন শরীরের অনুপযোগিতার কথা মনে করিয়ে দিল। অবশেষে এক শুভ মুহূর্তে বিট্টো তার পিতৃগৃহের দরজায় শেষ প্রণাম করে ধীরপদে শ্বশুর ঘরে ঢুকল। সেখানে ওর আগমনে অসহযোগ দেখানো দরকার মনে করে একটি প্রাণীও বিট্টোকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাল না।

ওর জীবনের এই করুণ কাহিনী বিট্টো আমাকে অনেকবার দেখা হবার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো করে শুনিয়েছিল। এক দিন ওকে বাসে উঠিয়ে বিদায় দিতে হল। কিন্তু ওর জীবনের কথা আমার হৃদয়ের কোনায় কোনায় বসে গিয়েছিল। তাই আমার সখীকে লিখে মাঝে মাঝে ওর খবর নিতেই হত।

আজ প্রায় চার বছর পরে ওর সম্বন্ধে এক অসাধারণ খবর পেয়েছি। সখী লিখেছে, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিষম জ্বরে অন্তিম

ক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন। পুত্রবধূ তো নেই, তবে পুত্ররা এসে টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ি সামলাতে শুরু করেছে। এই তৃতীয় বিমাতা সৎ-ছেলেদের চোখের বিষ। অতএব বেচারি বিট্রোর ভবিষ্যৎ আগের চেয়েও অন্ধকারময়।

ভাবলাম, বিট্রোকে তৃতীয়বার বিয়ে করে উদ্ধার করার মতো পরোপকারী লোকের অভাব, আমাদের এই পুণ্যভূমিতে বিশেষ এই জাগ্রত যুগে, কখনও হবে না।

দুটি ফুল

শীতের মিষ্টি আমেজ ভরা ফাল্গুনের সেই সোনালি সন্ধ্যা কি কখনও ভোলা যায়? সকাল বেলার বৈতালিক পাখির দল ডানায় পুলক ভরে নিয়ে যেন এক ছন্দোময় গতিতে নিজ নিজ নীড়ের দিকে ফিরে চলেছে। ছিন্ন মেঘের অন্তরাল থেকে সূর্যদেব তাদের ওপর যে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করছেন, সেগুলি তাদের উন্মাদ গতিতে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমে রঙের এই উৎসব দেখতে দেখতে হঠাৎ যেই মুখ ফিরিয়েছি দেখি সামনে চাকর এসে দাঁড়িয়েছে। জানা গেল, নিজের পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক এমন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে সকালে আসতে বললে সে কথায় তিনি কর্ণপাতই করছেন না।

তখন সবে আমার কবিতার প্রথম পংক্তিটি লেখা হয়েছে। তাই আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। আমার নিজের কাজের চেয়ে বেশি দরকারি আর কোন কাজ হতে পারে যার জন্য অসময়ে উপস্থিত হয়ে তিনি আমার কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তাকে খণ্ডিত করে দেবেন?

'আমি কবি' মনের এই গর্ব পুঞ্জীভূত হতে হতে যদি বিবেকের 'কিন্তু মনুষ্য নও' কথাটি আমাকে বিদ্ধ না করত, তবে আমি কিছুতেই উঠতাম না।

খানিক রেগে, খানিকটা বা কঠোর হয়ে, কোনো দিকে না তাকিয়ে এক পাটি নতুন আর একপাটি পুরনো চপ্পলে পা ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে পড়লাম। এসেই কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত আগন্তুকের সামনে একেবারে নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইলাম। ছেলেবেলা

কোনো চিত্রকরের আঁকা ঋষি কণ্বের ছবি দেখেছিলাম। বৃদ্ধের মধ্যে সেই চিত্র যেন সজীব হয়ে উঠেছে। দুধের চেয়েও শাদা চুল আর ধবধবে দাড়ি। চোখ দুটি এক সময়ে সতেজ ছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ঝকঝকে আয়নায় ফুঁ দিয়ে ধোঁয়াটে করে দিয়েছে। একদৃষ্টিতে তাঁর ধবল শির থেকে ধূলিভরা পা পর্যন্ত দেখে নিয়েই বললাম, 'আপনাকে তো চিনতে পারছি না!' তিনি তাঁর দুঃখে মলিন এবং অশ্রুতে উজ্জ্বল দৃষ্টি একবার তুলে কি জানি ব্যথায় কি লজ্জায় তাঁর কাশফুলের মতো শুভ্র পক্ষ্মযুক্ত পলক নত করলেন।

ক্লান্ত অথচ শান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'যাঁর দ্বারে এসেছি, তাঁর নাম জানি। প্রার্থীর পরিচয় এর চেয়ে বেশি আর কি হবে? আমার নাতনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য বড় ব্যাকুল। দুদিন দ্বিধায় কেটেছে। আজ সাহস করে এসেছি। কাল পর্যন্ত পাছে সাহস না থাকে, এই ভয়েই আপনাকে বিরক্ত করছিলাম। কিন্তু আপনি কি এতখানি কষ্ট স্বীকার করে যেতে পারবেন? টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।'

আমি অবাক হয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরিচিত, অপরিচিত সবাই জানে, আমি সহজে কোথাও আসা-যাওয়া করি না। ইনি হয়ত বাইরে থেকে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি নিজে আসতে পারে না?' বৃদ্ধের লজ্জিত হবার কারণ বুঝতে পারলাম না। তাঁর ঠোঁট নড়ল কিন্তু কোনো শব্দ বেরল না। তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখের জল ঢাকবার চেষ্টা করলেন! তাঁর কষ্ট দেখে আমি রোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। বললেন, তাঁর নাতনিটি আট বছরে মাতৃ-পিতৃহীন, আর এগার বছরে বিধবা।

অধিক তর্ক-বিতর্কের সময় ছিল না। ভাবলাম বৃদ্ধের নাতনি অবশ্যই মরণাপন্ন হয়েছে। বেচারি অভাগী বালিকা। কিন্তু আমি তো ডাক্তার-বদ্যি নই। মুণ্ডন, কর্ণ-ছেদন এসব কাজে যদিও লোকে

কবিকে ডাকে, অন্তিম মুহূর্তে গীতাবাচকের মতো তাকেও ডাকতে লোকে তো আজও শেখেনি। বৃদ্ধ যেভাবে আমার মুখের প্রত্যেকটি ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন, তাতে যেন আমার কণ্ঠ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'চলুন, কাউকে সঙ্গে নিই, ফিরতে ফিরতে তো অন্ধকার হয়ে যাবে।'

শহরের শিরার মতো চারিদিকে ছড়ান গলিগুলির সঙ্গে সেদিন আমার বিশেষরূপে পরিচয় হয়েছিল। নর্দমাগুলো দূষিত রক্তের মতো সেখানে বয়ে চলেছে, আর রোগের বীজাণুর মতো নোংরা ন্যাংটো ছেলেগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক তেতলা দালানের সিঁড়িগুলি কোনো রকমে পার হয়ে আমরা ওপরে পৌঁছলাম। দালানে ময়লা, ছেঁড়া শতরঞ্চিতে বসে রয়েছেন এমন একটি মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাঁর কোলে ময়লা কাপড়ে জড়ান একটা পিণ্ড মতো ছিল। বৃদ্ধ আমাকে ওখানে ছেড়ে, ভিতরের কামরা পার হয়ে অন্য দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে তাঁর ক্লান্ত শরীর আর ভাঙা মনের দ্বন্দ্ব ধোঁয়াটে চলচ্চিত্রের কোনও নির্বাক করুণ দৃশ্যের মতো দেখাতে লাগল।

উদাসীন কণ্ঠের আমন্ত্রণ পেয়ে অভ্যর্থনাকারিণীর দিকে একটু খেয়াল করে তাকালাম। বৃদ্ধের সঙ্গে ওঁর চেহারার অদ্ভুত মিল। সেই-রকম মুখের গড়ন, ঝকঝকে সজল চোখ, কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট। তিনি বললেন, 'আপনি বড় দয়া করেছেন! গত পাঁচ মাস ধরে আমরা যে কী কষ্টে দিন কাটিয়েছি, একমাত্র ভগবান জানেন। এতদিনে যা হক নিষ্কৃতি পেলাম। কিন্তু দেখুন তো মেয়ের জেদ। অনাথ-আশ্রমে দেবার নামও নিতে দেয় না অন্য কাউকে দিয়ে দেবার কথা বললে অন্নজল ত্যাগ করে। বারবার বলছি যাঁকে চিনি না জানি না তাঁকে এই বিপদে টেনে আনা কি ভাল মানুষের কাজ? কিন্তু কে শোনে কার কথা? বাবা তো সঙ্কোচে আপনার কাছে যেতেই চাননি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর কাছে হার মানতেই হল। এখন আপনি উদ্ধার করলে প্রাণ বাঁচে।

এতখানি লম্বা-চওড়া ভূমিকা শুনে আমি হতবাক। একটু পরে খানিক প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলাম।

যদি বলি, আমার শরীর শিউরে ওঠেনি, বা পা অবসন্ন হয়নি, অথবা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়নি, তবে অসত্য বলা হয়। বুদ্ধি দিয়ে সামাজিক বিকৃতির নিরূপণ অনেকবার করেছি। তবু জীবনের এই বিভীষিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে আমার পরিচয় এই প্রথম। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে আমার যে-দৃষ্টিভঙ্গি, তা লক্ষ্য করে পরিবারের প্রায় সকলেই নিরাশ হয়েছেন। তাঁরা আমার মনে এই বিশ্বাস এনে দেবার চেষ্টা করেছেন যে, আমার সাত্ত্বিক চিন্তাধারা এ ধরনের লুয়ের আঁচ সইতে পারবে না। আমি বারবার সকলকে বলেছি, 'কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায় না। তার জন্য নির্মল জল চাই। পদ্মের পাপড়ির ওপর মুক্তর মতো জলের ফোঁটাও দাঁড়াতে পারে না, এমনই তার স্বচ্ছতা। আর সেই গুণই তাকে পঙ্কের মধ্যে বেঁচে থাকার শক্তি দেয়।'

এসব কথা মনে পড়ে লজ্জিত হয়ে আমি ময়লা শাল সরিয়ে কাছে থেকে সেই শিশুটিকে দেখলাম—যাকে নিয়ে বাইরে ভিতরে এত বড় প্রলয় ঘটে গেল। উগ্রতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ নারীর উপেক্ষা-ভরা কোল আর মলিনতম আবরণ সেই কোমল মুখের ওপর এক অলক্ষিত করুণার ছাপ দিয়ে গিয়েছিল। কুচকুচে কালো ছোট ছোট চুল কপালের ঘামে ভিজে কালো কালো অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। আর বন্ধ দুটি চোখের পাতা গালের ওপর দুটি অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে ছোট লাল কুঁড়ির মত ঠোঁট ঘুমে আধখোলা, তাতে একটি স্বপ্নময় মধুর হাসি লেগে আছে। এর আবির্ভাবে কত পরিপূর্ণ হৃদয় শুষ্ক হয়ে গেছে, কত শুকনো চোখে বন্যা নেমেছে; কত জীবন দুর্বহ

হয়েছে ; তার কোনো জ্ঞানই ওর নেই। এই অনাহূত, অবাঞ্ছিত অতিথি নিজের সম্বন্ধেই বা কি জানে? ওকে জন্ম দিয়ে ওর মা কারো কাছে সম্মান পায়নি। সেদিনে কাউকে মেওয়া খাওয়ান হয়নি, মঙ্গলগান গাওয়া হয়নি। মাসি-পিসিরা নিজ নিজ উপহার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করেননি। পিতা একে নিজ আত্মার প্রতিরূপ মনে করেননি। মায়ের কোলটি থেকে পর্যন্ত ওকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিষাদের গভীরতা যখন অসহ্য মনে হল, তখন আমি সেই মেয়েটিকে একবার দেখতে চাইলাম। পিসি উদাসীনভাবে দালানের বাঁদিকে এক অন্ধকার ঘরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন।

ঘরের ভিতর গিয়ে প্রথম তো স্পষ্ট কিছু দেখতেই পাই নি। কেবল কাপড়ের সরসর আওয়াজের সঙ্গে খাটের ওপর ছায়ার মতো কেউ উঠে দাঁড়াল, টের পেলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ যখন অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন আমি দেয়াল আলমারিতে রাখা প্রদীপের পাশ থেকে দেশলাই তুলে নিয়ে আলো জ্বাললাম।

ওরকম করুণ দৃশ্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। খাটের ওপর ময়লা সতরঞ্চি পাতা, ময়লা চাদর আর তেলের দাগ লাগা তাকিয়ার পাশে যে করুণ মূর্তি দেখলাম, তার যথাযথ বর্ণনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বয়স ওর আঠার বছরের বেশি নয়, রোগা, দুর্বল, অসহায় মতো দেখতে। শকুন ঠোঁট, শামলা রঙ আর রক্তহীন মুখে চোখ দুটি জ্বলছে, যেন তেলবিহীন প্রদীপের শিখা।

সেই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় ওর মনের অবস্থা কল্পনা করে আমি মাথার কাছে রাখা উঁচু চৌকির ওপর থেকে ঘটিটা সরিয়ে সেখানটায় বসে পড়লাম। আজ বলতে পারব না, সেই সময় কি অজ্ঞাত প্রেরণায় আমার মনের নিষ্ক্রিয় ক্রোধ সহস্র স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছিল।

নিজের অকাল বৈধব্যের জন্য ওকে দোষী করা যায় না। কেউ যে ওকে প্রবঞ্চনা করেছে, তার দায়িত্বও ওর ওপর দেওয়া যায় না।

কিন্তু ওর আত্মার যে অংশ, হৃদয়ের যে খণ্ড, ক্ষুদ্র শিশুটিতে আকার পেয়েছে, তার জীবন-মৃত্যুর জন্য কেবল ও-ই দায়ী। কোনো পুরুষ যদি ওকে পত্নী বলে স্বীকার না করে, তবে কেবল সেই মিথ্যার জন্য সে নিজের জীবনের এই সত্যকে, নিজের সন্তানকে অস্বীকার করবে? সংসার যদি ওর পরিচয় দেবার মতো কিছু নাও থাকে, তবু নিজের পুত্রের কাছে তো সে মহিমময়ী জননীর সম্মানই পাবে। এই কর্তব্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা ও কেন করছে? সে কি কেবল এই জন্য যে বঞ্চক সমাজে ফিরে গিয়ে গঙ্গাস্নান, ব্রত, উপবাস, পূজাপাঠ —ইত্যাদির দ্বারা আবার সে সতী বিধবার ভান করে জীবন কাটাবে!

আমি ভাবাবেগে এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, সে সময়ের কথাবার্তা ঠিক ভাবে মনে করতে পারছি না। কিন্তু মেয়েটি খাট থেকে নেমে দুর্বল হাতে আমার পা জড়িয়ে হাঁটুর মধ্যে যখন মুখ ঢাকল, তখন ওর চোখের নিস্তব্ধ জলের ধারা অনুভব করে আমার মনে অনুতাপ এল।

নীরব অশ্রুর মধ্যে অস্ফুট শব্দে ও আমাকে একথাই বোঝাতে চেষ্টা করল, ওর বাচ্চাকে ও দিতে চায় না। ওর ঠাকুরদা যদি রাখতে রাজি না হন, তবে আমি যেন ওর জন্য এ রকম ব্যবস্থা করে দিই যাতে দিনে একবার দুটি শুকনো রুটি ও খেতে পায়। আমার ছেঁড়া কাপড় পরেই ওর চলে যাবে। আর তো কোনো খরচ ওর নেই। পরে যখন বাচ্চা বড় হয়ে যাবে, তখন যে কাজ ওকে করতে বলব, ও প্রাণপণে সে কাজ করে জীবন কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু যতক্ষণ ও অন্য কোনো অপরাধ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন আমি ওকে নিজের মেয়ের মতো দেখি। ওর মা নেই, তাই ওর এই দুর্দশা সম্ভব হয়েছে। এখন যদি আমি ওকে মায়ের মমতা দিতে পারি, তবে ও ছেলে নিয়ে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে।

সাতাশ বছর বয়সে আঠার বছরের মেয়ে আর বাইশ দিনের নাতির ভার আমাকে নিতেই হল।

সেই বৃদ্ধ আজ কোন অজ্ঞাতলোকে চলে গেছেন। মলয়ের হিল্লোলের মত কণ্টকবনে টেনে নিয়ে গিয়ে, যে দুটি ফুলের ভার তিনি আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আমি স্নেহের সুরভি খুঁজে পেয়েছি।

এখন সেই ফুল দুটির মধ্যে একটির নালিশ হচ্ছে, আমি ওর কথা শোনবার অবসরই পাচ্ছি না, আর অন্যটি বলছে, কেন আমি ওকে রাজপুত্রের কাহিনী শোনাচ্ছি না।

ঘীসা

বর্তমানের কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় ভুলে-যাওয়া অতীত আমাদের চোখে আবার সজীব হয়ে ওঠে জানি না। তাই আজ হঠাৎ সেই রোগা, কালো, লাজুক, ছোট্ট গ্রাম্য ছেলেটির কথা কেন মনে পড়ল বুঝতে পারছি না। সেই ছেলেটি একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো নিজের সমস্ত আর্দ্রতা নিয়ে আমার জীবনতট ছুঁয়েই অনন্ত জলরাশিতে বিলীন হয়ে গেছে।

গঙ্গার তীরে ঝুঁসীর পরিত্যক্ত স্থান আর তার আশপাশের গ্রামগুলির প্রতি আমার এক অকারণ আকর্ষণ আছে। ছুটির দিনে লোকে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, কি বেড়াতে যায়, কি অন্য কোনোরকম আমোদে কাটায়। আমি কিন্তু সেসব দিনগুলি ভাগীরথীর এই ক্ষত-বিক্ষত তটের ওপর আনন্দেই কাটাই।

দূরের বাড়িগুলো পুতুলের খেলাঘরের মতো দেখায়। সেসব জীর্ণ শীর্ণ ঘর থেকে যে বৌরা পিতল কি তামার মতো ঝকঝকে নতুন মাটির লাল ঘড়া নিয়ে গঙ্গায় জল ভরতে আসে, তাদের আমি চিনে গেছি। তাদের মধ্যে কেউ লাল বুটিদার, কেউ কালো, কেউ শাদা, কেউ খুব ময়লা, কেউ খানিক ছেঁড়া শাড়ি পরে আসে। কারো মোম লাগানো চুলের পাটির মধ্যে এক আঙুল চওড়া সিন্দূরের রেখা অস্তগামী সূর্য কিরণে চকচক করছে। কারো বা সর্ষের তেলও পড়েনি এমন চুলের ছোট গোছা মুখখানাকে ঘিরে তার উদাসভাব আরো বাড়িয়ে তুলেছে। কারো গোল শামলা হাতে শহরের কাঁচের চুড়ি হীরের চেয়েও ঝলমল করছে। কারো বা রোগা কালো হাতে গালার হলদে চুড়ি কালো পাথরের ওপর চন্দনের রেখার মতো। কেউ বা গিল্টির বালা-পরা হাতখানি ঘড়ার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছে

আবার কেউবা রূপোর কঙ্কণের ঝঙ্কার তুলে কথাবার্তা বলছে। কারো কানের গলার গয়না শাড়ির ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে। কারো বা নতুন ধরনের ঝালরদার জিনিস কখনও গাল, কখনও গলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মোটাসোটা কালো পায়ে কারো রূপোর মল সুন্দর দেখাচ্ছে, আর কারো পায়ের ছড়ানো আঙুলের জন্য, কালো রঙের কাঁসার মল লোহার বেড়ির মতো মনে হচ্ছে।

ওরা সবাই প্রথম হাতমুখ ধোয়, তারপর জলের মধ্যে নেমে ঘড়া ভরে নেয়। সব শেষে ঘড়া কিনারায় রেখে মাথার ওপর বিড়ে ঠিক করতে করতে আমার দিকে তাকায়। সেই সময় কখনও মলিন, কখনও উজ্জ্বল, কখনও দুঃখের ব্যথাভরা কিংবা সুখের কথাভরা মৃদুহাস্যে ওদের মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমার আর ওদের মধ্যে যে দূরত্ব সে ওরা জানে। তবু হাসির সেতু দিয়ে সেটা জুড়ে দিতে ওরা ভোলে না।

গয়লাদের ছেলেরা মাঠে গরু-মোষ চরাতে চরাতে তাদের কোনোটাকে এদিকে আসতে দেখে লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসে। আবার ছাগলওয়ালার দলের দু-একটি ছাগল-ভেড়া এদিকে এগোলেই সে তাদের কান ধরে নিয়ে যায়। সমস্ত দিনভর অনর্থক গুলিডাণ্ডা খেলায় রত, অকর্মণ্য ছেলেরাও মাঝে মাঝে আমার নজর বাঁচিয়ে আমার দিকে তাকাতে ভোলে না।

ওপারে শহরে দুধ বেচতে যাবার অথবা ফিরে আসার সময় গোয়ালারা, কেল্লায় কাজ করতে যাবার সময় মজুররা, নৌকা বাঁধতে কি খুলতে গিয়ে মাঝি-মাল্লারা কখনও কখনও গান করতে করতে আমার দিকে চোখ পড়তেই থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। বিশেষ সভ্য দু-একজন আবার সলজ্জ নমস্কারও করে।

এখানকার ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শেখাবার কথা কি করে যে আমার মাথায় এল জানি না। কার্যকরী সমিতির নির্বাচন ছাড়া, বিনা

ভবনে, চাঁদার আপিল বিনা, চিরপরিচিত সমারোহ বিনা, যখন আমার বিদ্যার্থীরা অশ্বত্থগাছের ঘন ছায়ায় আমার চারদিকে জড় হয়ে গেল, তখন আমি অতি কষ্টেই গুরুর উপযোগী গাম্ভীর্যের ভার বহন করেছিলাম।

আর সেই ছাত্ররা কেমন ছিল কী করে বলি? কেউ কানে বালি আর হাতে বালা পরে, ধোয়া কুর্তা আর খাটো ময়লা ধুতিতে সেজে আসত। কয়েকজন আবার বড় ভাইয়ের পা পর্যন্ত লম্বা কুর্তা পরে খেতে দাঁড় করান নকল মানুষের কথা মনে করিয়ে দিত। কারো বা বড় পেট আর সরু বাঁকা পা থাকায় অনুমানে মনুষ্য সন্তান বলে ধরা যেত। আবার এক-একজনের রোগা চেহারায়, মলিন মুখের করুণ সৌম্যতায় আর নিষ্প্রভ হলদে চোখে সংসারের উপেক্ষা ভরা রয়েছে দেখতাম। কিন্তু ঘীসা ওদের মধ্যে একক। আমার স্মৃতিতে সবসময় ও একাই আসে।

সেই দিনকার গোধূলি আমি আজও ভুলিনি। সন্ধ্যার লাল সোনালি আভা মেশান দুকূলের ওপর রাত্রি যেন লুকিয়ে অঞ্জনের মুঠো ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার নৌকার মাঝি চিন্তিত হয়ে ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। বুড়ি ভক্তিন আমার বইপত্র, কাগজ-কলম নৌকার ওপর গুছিয়ে রেখে হয়তো যে বিধাতা আমাকে গড়েছেন, তাঁর ওপর, নয়তো বাইরের অন্ধকারের ওপর বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করছিল। আমার খামখেয়ালিপনার পরিণাম সহ্য করা ছাড়া বেচারী আর কি পাচ্ছে, ভেবে আমার মনটাও মমতায় ভরে উঠেছিল। নৌকার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে দেখলাম একটি মেয়ে আমার কাছেই আসছে। তার শামলা রঙ, লম্বাটে মুখে পাতলা কালো ঠোঁট, ছোট ছোট চোখ ব্যথায় আর্দ্র। ময়লা থানে সমস্ত গা ঢাকা, তবু তার ফাঁকে সুগঠিত শরীরের আভাস পাওয়া যায়। একটি রোগা, অর্ধনগ্ন ছেলের কাঁধে হাত রেখে ও এবার দাঁড়াল।

মেয়েটি থেমে থেমে, কিছুটা কথায় কিছুটা সঙ্কেতে যা বলল তাতে আমি কেবল এইই বুঝতে পারলাম যে, ওর স্বামী নেই। অন্যের ঘর নিকনোর কাজে ও চলে যায় আর ওর ছেলেটি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমি যদি অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে একেও বসতে দিই, তবে ও হয়তো কিছু শিখতে পারে।

পরের রবিবার আমি ওকে সকলের পিছনে একা বসে থাকতে দেখলাম। পাকা কালো গায়ের রঙ, কিন্তু মুখখানি বিশেষরূপে সুডৌল আর তাতে দুটি হলদে অথচ সজাগ চোখ। পাতলা দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট আর মাথায় খাড়া খাড়া ছোট চুল। হাড় উঁচু কাঁধ থেকে সরু সরু হাত দুখানি এ ভাবে ঝুলছে যেন অভিনয়ে বিষ্ণুর নকল বাহু দুটি। সব সময় দৌড়োদৌড়ি করাতে সেই নমনীয় শরীরে পা দুটিকেই বেশি পুষ্ট মনে হল। এই তো গেল ঘীসার আকৃতি। নামেও যেমন কবিত্বের লেশ নেই, শরীরেও না।

অথচ ওর সজাগ চোখ দুটিতে কি জানি কি রকম জিজ্ঞাসা ভরা ছিল। চোখদুটি ঘড়ির মতো আমার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়েই থাকত। মনে হয় আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি শিখে নেওয়ার জন্য ওর অসীম আগ্রহ।

অন্য ছেলেরা ওর কাছ থেকে একটু সরে সরেই থাকত। কারো মা, কারো ঠাকুরমা কি পিসিমা ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঘীসার কাছ থেকে দূরে দূরেই ওদের থাকতে হবে। ওরা আমাকে এ কথাটাও বলল, আর ঘীসার এই বিশ্রী নামের রহস্যটাও প্রকাশ করল। বাপ তো ওর জন্মাবার আগেই মারা গেছে। ঘরে দেখাশোনা করার লোক না থাকায় মা বাঁদরের বাচ্চার মতো ওকে চেপে ধরে সঙ্গে নিয়ে চলত। ওকে এক পাশে শুইয়ে দিয়ে মা যখন মজুরীর কাজে লেগে যেত, তখন পেট দিয়ে ঘষে ঘষে সংসারের প্রথম অনুভবের সঙ্গে ও এই নামের যোগ্যতাও অর্জন করেছে।

অন্য মেয়েদের কাছে ওর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু কথা জানতে পারলাম। ওর বাপ জাতিতে জোলা হয়েও খুব তেজী ছিল। অন্য এক জায়গায় গিয়ে ছুতর মিস্ত্রীর কাজ শিখে এল। আর যুবতী বৌ এনে গ্রামের সুন্দরী মেয়েদের আর তাদের মা-বাপকে নিরাশ করে দিল। এত অন্যায় মানুষ সইতে পারে, কিন্তু ভগবান সইতে পারেন না। তাই ভদ্রলোকদের ঘরে চুনকাম করে দিয়ে, আর চৌকাঠ জানালা তৈরি করে ও যখন একটু ভাল ভাবে থাকতে শুরু করল, তখন একদিন কলেরায় মারা পড়ল। দেখা গেল স্ত্রীও কম তেজী নয়। গ্রামের অনেক অবিবাহিত জোলা ওর জীবনের দায়িত্ব নিতে চাইল। ও উত্তর দিল, আমি সিংহের বৌ, শিয়ালের ঘর করব না।

তারপর যখন চুড়ি ভেঙে, থান কাপড় পরে বড় ঘরের বিধবার মতো চলতে শুরু করল, তখন সারা সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এ দিকে ঘীসা জন্মাল বাপের মৃত্যুর পর। আসলে বাপ মারা যাবার ছমাস পরেই ওর জন্ম। কিন্তু সে সময়টাকে রবারের মতো টেনে যদি এক বছরে পৌঁছে দেওয়া হয় তাতে গ্রামের লোকদের আর বেশি দোষ দেওয়া যায় কি ?

নিজের জন্ম সম্বন্ধে এই অপবাদ ও নিজে কোনো দিন বুঝতেও পারেনি। কিন্তু তবু সকলকে এ ভাবে নিজের ছায়া থেকে ও বাঁচিয়ে চলত যেন ওর কোনো ছোঁয়াচে রোগ আছে।

পড়ায়, পড়ার বিষয় সবচেয়ে আগে বোঝায়, তার প্রয়োগে, বইয়ের যত্নে, শ্লেট পরিষ্কার রাখায় আর নিজের ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব গম্ভীর ভাবে পালন করায় ওর মতো কেউ ছিল না। তাই মাঝে মাঝে আমার মন চাইত, ওর মায়ের কাছ থেকে ওকে নিয়ে এসে ওর শক্তিগুলোর বিকাশের ব্যবস্থা করি। কিন্তু সেই উপেক্ষিতা মানিনী বিধবারও যে ঘীসাই একমাত্র অবলম্বন। ও নিজের স্বামীর দেশ ছেড়ে যে কোথাও যেতে চাইবে না, তা বুঝেছিলাম। ছেলেকে ছেড়ে

থাকতে হলে ওর জীবন যে দুর্বহ হবে তাও অনুভব করতাম। আর ন বছরের কর্তব্যপরায়ণ ঘীসার গুরুভক্তি দেখে ওর মাতৃভক্তি সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল?

শনিবার দিনই ও নিজের রোগা হাতে অশ্বত্থতলার ছায়াটিকে গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়ে রাখত। তারপর রবিবার মা কাজে বেরিয়ে যেতেই একটি ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা মোটা রুটি, খানিকটা নুন আর ছোলাভাজা, একটু গুড় বগলের নীচে চেপে অশ্বত্থের ছায়াটিকে আরেকবার ঝাঁট দিয়ে গঙ্গার তীরে এসে বসত। আর নিজের সতেজ চোখদুটি ক্ষীণ, শামলা হাত দিয়ে আড়াল করে দূর দূর পর্যন্ত দেখত। যখনই আমার নীল-শাদায় মেশানো নৌকা ওর চোখে পড়ত তখনই ও রোগা পায়ে তীরের মতো দৌড়ে 'গুরু সাহেব' 'গুরু সাহের' বলতে বলতে আবার গাছের নীচে চলে যেত। সেখানে বসে বারবার শেখা পাঠের আর একবার শেষ আবৃত্তি করে নিত। গাছের নীচু ডালে রাখা আমার শীতল পাটি নামিয়ে ঝেড়ে-পুঁছে বিছিয়ে দিয়ে, কাঁচের দোয়াতের শুকনো কালি, আর ভাঙ্গা নিবওয়ালা, রঙ-ওঠা কলম গাছের কোটর থেকে বের করে যথাস্থানে রেখে দিত। তারপরে এই বিচিত্র পাঠশালার বিচিত্র মন্ত্রী আর বিশিষ্ট বিদ্যার্থী এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হত।

মাসে চারদিনই কেবল আমি ওখানে যেতে পারতাম, আবার কখনও কখনও কাজ বেশি থাকলে আরো দু-একটি ছুটির দিন পড়ে যেত। অথচ সেই অল্প সময়ে গোনা গুনতি দিনের মধ্যে সে ছেলেটির হৃদয়ের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তা ছবির এলবামের মতো নিরন্তর নূতন মনে হয়।

আজও সেদিনের কথা আমি ভুলিনি যেদিন কাপড়ের ব্যবস্থা না করেই আমি সে বেচারিদের পরিচ্ছন্নতার মাহাত্ম্য বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত করে দিয়েছিলাম। পরের রবিবার সবাই তো যেমন ছিল

তেমনই চলে এল। কেবল গঙ্গায় এ ভাবে মুখ ধুয়ে এল যাতে মালা-গুলি অনেক রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। আর কেউ কেউ হাত আর পা দুখানি এমন ভাবে ধুয়ে এল, যাতে অবশিষ্ট মলিন শরীরের সঙ্গে হাত-পাগুলিকে আলাদা জুড়ে দিয়েছে বলে মনে হল। কেউ কেউ আবার ছেঁড়া ময়লা জামা ঘরে ছেড়ে এমন অস্থি-পঞ্জরময় শরীরে এসে উপস্থিত হল, তার মধ্যে ওদের প্রাণটুকু কি করে যে টিঁকে আছে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু ঘীসা গায়েব হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে পর ছেলেরা সবাই মিলে প্রথম খানিকটা ওদের মধ্যে কানাঘুষো করতে লাগল। তারপর সবাই একসঙ্গে বলার জন্য ব্যস্ত হল। শুনলাম, ঘীসা কাপড় কাচা সাবানের জন্য মাকে তখন থেকে বলছে। অথচ মায়ের মজুরীর টাকাও পায়নি আর দোকানদার চাল-ডালের বদলে সাবান দিতে রাজি হল না। কাল রাতে মা পয়সা পেয়েছে। তাই আজ সকালে ও সব কাজ ফেলে সাবান কিনতে গেছে। এতক্ষণে সাবান কিনে ফিরে এসে ঘীসা কাপড় কাচতে আরম্ভ করেছে। কারণ গুরু সাহেব তো বলেছিলেন, স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে আসতে হবে। সেই অভাগার কাছে কাপড়ই বা কোথায়? কোনো দয়া-বতীর দেওয়া পুরন কুর্তার একটি আস্তিনের অর্ধেক নেই, সেটি গায়ের, আর পরনের আছে গামছার মতো ছোট একটি ছেঁড়া টুকরো। ঘীসা যখন স্নান করে ভেজা গামছা জড়িয়ে আর আধভেজা কুর্তা পরে অপরাধীর মতো আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আমার চোখ দুটিই নয় শুধু, প্রতি রোমকূপ স্নেহে সিক্ত হয়ে উঠল। সে সময় বুঝলাম, দ্রোণাচার্য তাঁর ভীল শিষ্যের কাছ থেকে বুড়ো আঙ্গুল কাটিয়ে নিয়েছিলেন কি করে।

একদিন জানি না কি ভেবে আমি ওখানকার ছাত্রদের জন্য ৫।৬ সের জিলিপি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওজনকারীর চাতুর্যে ছেলেদের কাড়াকাড়িতে পাঁচ খানার বেশি কেউ পেলো না। একজন বলছে,

আমি একটা কম পেয়েছি। অন্যজন বলল, 'আমারটা কেড়ে নিল।' আরেক জনের বাড়িতে ঘুমন্ত ছোট ভাইয়ের জন্য একটা চাই। চতুর্থ জনের হয়তো অন্য কারো কথা মনে পড়ে গেল। অথচ এই গণ্ডগোলের মধ্যে নিজের ভাগের জিলিপি নিয়ে ঘীসা কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। একটি দুষ্টু ছেলে ওর সঙ্গীকে বলছিল, ঘীসা যে কুকুরের বাচ্চা পুষেছে, তাকে বোধহয় খাওয়াতে গেছে। এমন সময় ওদিকে আমার চোখ পড়তে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। এর মধ্যে ঘীসা ফিরে এসেছে। ওর সব হিসেব ঠিক ছিল। মায়ের জন্য দুখানা ঘরে রেখে এসেছে। একখানা দিয়েছে মা ছাড়া কুকুরছানাটিকে আর দুখানা নিজে খেয়েছে। আরো চাই কিনা জিজ্ঞেস করতেই ও সঙ্কোচে চোখ নামাল, ঠোঁট একটু কাঁপল। বলল, কুকুরছানাটা একটা কম পেয়েছে। গুরুজী দেন যদি তো ওর জন্যই একটা দিন।

হোলির আগের একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে এমন পাকা রঙে আঁকা রয়েছে, যা কোনো দিন মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া সে সময় ধীরে ধীরে বাড়ছিল। ঘীসা দু-সপ্তাহ ধরে জ্বরে পড়েছিল। ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু দেখাশোনা করার ঠিক ব্যবস্থা হচ্ছিল না। দু-চারদিন ওর মা নিজে ওর কাছে ছিল। তার পর থেকে একটি অন্ধ বুড়িকে ছেলের কাছে বসিয়ে রেখে কাজে যেতে শুরু করল।

রবিবারের সন্ধ্যায় বাচ্চাদের ছুটি দিয়ে ঘীসাকে দেখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই অশ্বত্থ গাছ থেকে পঞ্চাশ পা এগিয়ে যেতেই ওকে পড়তে পড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। জানি যে গত পনের দিন ধরেই ও বিছানায়। তাই ওকে সন্নিপাতগ্রস্ত মনে করে উদ্বিগ্ন হলাম। ওর রোগা শরীরে চোখ দুটি আরো সতেজ, আর মুখখানা এ রকম দেখাচ্ছিল যেন হালকা আঁচে লোহার টুকরো

ধীরে ধীরে লাল হচ্ছে। কিন্তু ওর বুদ্ধির পরিচয় আমাকে আরো বেশি চিন্তায় ফেলল।

তেষ্টায় জেগে গিয়ে পাশে জল পায়নি। মনিয়ার অন্ধ বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে চাইবে না ভেবে চুপচাপ কষ্ট সইতে লাগল। এর মধ্যে মুল্লুর কাকা ওপার থেকে ফিরে গিয়ে ওদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অন্ধ বৃদ্ধাকে বলল যে, শহরে দাঙ্গা হচ্ছে। শুনেই ওর গুরুজীর কথা মনে পড়ল। মুল্লুর কাকা সরে যেতেই ও এত আস্তে আস্তে উঠল যে বৃদ্ধা টেরই পেল না। আরপর কখনও ঘরের দেয়াল, কখনও গাছ ধরে ধরে এদিকে এসেছে। আমাকে তখন ও বলতে লাগল, গুরু সাহেবের পায়ে ধরে এখানেই ও এখন পড়ে থাকবে, কিছুতেই ওপারে যেতে দেবে না।

আমার সমস্যা জটিল হয়ে উঠল। ওপারে তো আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু অসুস্থ ঘীসাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করে তবে। অথচ সর্বদা সঙ্কোচে ভরা, নম্র, অজ্ঞানুবর্তী ঘীসা আজ এ রকম দৃঢ় আর জেদী বালকে পরিণত হল কি করে? দুটি হত ও আহত মাল্লাকে ও দেখেছিল। রোগে বিকৃত মস্তিষ্কে সেই চিত্র গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেছে। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ আমি ওর মনের এমন একটি তারে ঘা দিলাম, যার সুর তখনও আমার কাছে অপরিচিত ছিল।

যেসব বিদ্যার্থী আমার কাছে থাকে, তারা রেলে করে অনেক দূর দূর থেকে আসে। বছরে একবার মোটে মায়ের কাছে যায়। আমি না গেলে ওরা একা থাকতে ভয় পাবে—বলতেই ঘীসার সমস্ত বিরোধিতা কোথায় চলে গেল। ও আর তর্ক করবে কি করে? যারা সন্ধ্যায় মায়ের কাছে যেতে পারবে না, গুরু সাহেবকে তো তাদের কাছে যেতেই হবে। ঘীসা যদি বাধা দেয় তো ভগবানজী রাগ করবেন। কারণ ওকে একা একা ঘুরতে দেখেই তো উনি গুরু-

সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কথা মনে পড়ে আজও আমার মন ভরে ওঠে। কিন্তু সেদিন আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য উৎসুক, জ্বরে অশক্ত শরীর ঘীসাকে যখন ওর খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে ফিরে এলাম, তখন আমার মনে কৌতূহলের মাত্রাই অধিক ছিল।

ঘীসা ভালো হয়ে গেলে পর ধুলো আর শুকনো পাতায় ভরা গরমের হাওয়ার সঙ্গে রোজ ওকে সংগ্রাম করতে হত। ঝাড়তে ঝাড়তেই সেই পাঠশালা ধূলি-ধূসরিত হয়ে উঠত। তারপর হলদে সবুজ ঝরা-পাতার চাদরে জড়িয়ে, সেই ক্ষ্যাপা হাওয়া বিভ্রান্ত ছেলেটিকে নাকাল করতে ছুটে আসত। সে সময় আমি বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওখানে থাকব স্থির করলাম। ঘীসা কিন্তু বালিপড়া চোখ ঘসে ঘসে বারবার বই-এর ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে দিনভর সেখানে গাছের নীচেই বসে থাকত। ও যেন কোনো প্রাচীন যুগের তপোব্রতী-অনাগারিক ব্রহ্মচারী। ওর তপস্যাভঙ্গের জন্যই বুঝি লুয়ের এত জোর দাপট।

ওদের ছেড়ে যাবার দিন আসতেই আমার মন ব্যাকুল হল। কয়েকটি বালক উদাসীন হয়ে রইল, কেউ বা খেলার জন্য ছুটি পাওয়ায় প্রসন্ন হল। কেউ জানতে চাইল, ছুটির দিনের হিসেব কি করে রাখবে—চুনের টিপ দিয়ে, না কয়লার রেখা টেনে? বর্ষার দিনে যখন ঘরে জল পড়বে তখন কি করে এই আট পৃষ্ঠার বইটিকে বাঁচিয়ে রাখবে—সেই প্রশ্নই কারো কারো মনে এখন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কেউ আবার কাগজপত্রের ওপর ইঁদুরের অকারণ উৎপাতের কথা ভেবে অস্থির। এই গণ্ডগোলের মধ্যে ওর থাকা অনাবশ্যক বুঝে ঘীসা কোথায় চলে গেছে। আমার মন ভার হয়ে চোখে জল আসছে। কারণ ডাক্তাররা তখন আমার একটা অপারেশনের কথা ভাবছিলেন। তাই কখন ফিরব, কি মোটেই ফিরব কি না ভাবতে ভাবতে চারি-দিকে আর্দ্র দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছি।

বর্ষায় গঙ্গার ধারে আধডোবা বাড়িগুলি দেখে নদীর মধ্যে পুরনো

নৌকা বলে ভুল হচ্ছিল। তীরের বালিতে তরমুজ আর খরমুজের খেত। সেখানে পাহারাদারদের কুঁড়ে ঘরগুলো দেখে আদিম যুগের দ্বীপ বলে মনে হচ্ছে। ওর মধ্যে দু-একটি প্রদীপও জ্বলছে। এ সময় অনেকটা দূর থেকে একটি ছোট কালো মূর্তি এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ও যে ঘীসাই হবে তা আমিও দূর থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম। আজ গুরুসাহেবকে বিদায় দিতে হবে, একথা ওর ছোট্ট হৃদয় তার পুরো সংবেদনশক্তি দিয়ে অনুভব করেছিল। কিন্তু সেই উপেক্ষিত বালকের মনে আমার জন্য কতখানি মমতা ভরা ছিল, আর আমার বিচ্ছেদে তার কতটা ব্যথা বোধ হতে পারে, তা বুঝতে তখনও আমার বাকি ছিল।

কাছে এলে পর দেখলাম সেই আবছা গোধূলিতে বাদামি কাগজের ওপর কালো ছবির মতো খালি গায়ে একটা বড় তরমুজ দুহাতে ধরে ঘীসা দাঁড়িয়ে আছে। তরমুজের মাঝখানটায় একটু কাটা অংশের ভিতর থেকে তার লালচে আভা বেরিয়ে আসছে। চার পাশটা গাঢ় সবুজ থাকায় মধ্যের অংশটাকে একটি আধফোটা গোলাপি রঙের ফুলের মতো দেখাচ্ছে।

ঘীসার কাছে পয়সাও নেই, খেতও নেই। তবে কি ওটা ও চুরি করেই নিয়ে এল ? আমার মনের এট সন্দেহ প্রকাশ হয়ে পড়তেই জানলাম, জীবনের খাঁটি সোনাটুকুকে লুকিয়ে রাখার জন্য যে ঈশ্বর এই মলিন দেহটির সৃষ্টি করেছেন, তিনি সেই বৃদ্ধেরই মত, যে নিজের সোনার মোহর মাটির দেওয়ালের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত থাকত। ঘীসা গুরু সাহেবের কাছে মিথ্যা বলাকে ভগবানজীর সামনে মিথ্যা বলার সমান মনে করত। তরমুজটা অনেকদিন আগেই ও দেখে এসেছিল। আজ মায়ের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সে একাই সেই খেতে গেল। ঘীসার নতুন কুর্তাটির ওপর খেতওয়ালার ছেলের অনেকদিন থেকেই নজর ছিল। প্রায়ই ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'পাতের এঁটো খেয়ে যাদের দিন কেটে যায়, তাদের কেন এত ভাল জিনিস দেওয়া ?' আজ

ছেলেটি বলল, পয়সা না থাকলে কুর্তা দিয়ে তরমুজটী নিয়ে যেতে পার। আজ যদি তরমুজ না নিত, তবে কাল ওটা দিয়ে ঘীসা কি করত? তাই কুর্তাটি ওকে দিয়ে এসেছে। গুরু সাহেব যেন সেজন্য কিছু চিন্তা না করেন। গরমের দিনে ও তো কুর্তা পরেই না। আর কোথাও আসা যাওয়ার জন্য পুরনোটাই যথেষ্ট। তরমুজ পাছে শাদা হয়, তাই কাটিয়ে দেখতে হল। মিষ্টি হয় কিনা দেখার জন্য আঙুল ঢুকিয়ে খানিকটা বার করেও নিতে হল।

গুরু সাহেব যদি না নেন তো ঘীসা রাতভর কাঁদবে, ছুটিভর কাঁদবে। আর যদি নিয়ে যান তবে রোজ স্নান করে গাছের নীচে বসে পড়া পাঠ সমস্ত বারবার করে পড়বে, আর ছুটির পরে সমস্ত বই লিখে দেখাবে।

নিজের ভালবাসায় প্রগল্‌ভ সেই বালকের মাথায় হাত রেখে ভাবের আতিশয্যে আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম। এই নদীর তীরে কোনো গুরু যে কখনও কোনো শিষ্যের কাছ থেকে এ রকম দক্ষিণা পেয়েছেন, তা আমার বিশ্বাস হয় না। সেই দক্ষিণার কাছে সংসারের সমস্ত আদান-প্রদানই আমার চোখে আজ ফিকে হয়ে পড়ে।

ঘীসার খুশি হবার বিশেষ ব্যবস্থা করে আমি বাইরে চলে গেলাম। তারপরে অনেক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে ওর কোনো খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার যখন আমার ওদিকে যাবার অবসর হল, ততদিনে ঘীসাকে ওর ভগবানজী চিরকালের জন্য পড়া থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন।

আজ আমার সেই কাহিনী বলার শক্তি নেই। কিন্তু যদি সম্ভব হয়, আজ থেকে কাল, মাস থেকে বছর কেটে যাবার পর দার্শনিকের মতো ধীরভাবে আমি সেই ক্ষুদ্র জীবনের উপেক্ষিত অংশটি বলতে পারব। এখন আমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট যে, আমি অন্য মলিনমুখে ওর মুখের ছায়া খুঁজি।

পঙ্কজা

ভারী ঢাকার নীচে রাখা প্রদীপের মতো আকাশে বিদ্যুতের চমক থেমে গিয়েছিল। বাতাস সন্ধ্যা থেকেই মেঘগুলিকে স্তরে স্তরে সাজাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। আর এখন তারা এতখানি ঘন হয়ে উঠেছে যে, রাতটিকে যেন এক অখণ্ড কালো পাথরের ছাত বলে ভ্রম হচ্ছে।

সেদিন আমার মন বড় ভার হয়ে ছিল। লেখাপড়া করার জন্য বাইরে আমার যে ছোট ঘরটি আছে, সেখানে টেবিলের ওপর মাথা রেখে মাথার ব্যথাটা ভোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম। ছাত্রাবাসে সুদূর দক্ষিণে দেশের একটি মেয়ে টাইফয়েডে ভুগছে। সেই মেয়েটির মুখ আমার বন্ধ চোখের পাতার সামনে কোনো ফটোর এনলার্জমেন্টের মতো কেবল বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল। সাধারণ অবস্থার মা বাবা এত টাকা কোথায় পাবে যে ওকে দেখতে আসবে? ওর জন্য মন যতই চিন্তাকুল হল, নিজের ওপর রাগ ততই বাড়তে লাগল।

আমার শরীর যদি এমন অশক্ত হয় যে, এদের সুখে-দুঃখে দু-চার রাত জাগতে আমি কষ্ট মনে করি, তবে কোন সাহসে আমি এসব মেয়েদের তাদের মায়ের কাছ থেকে এত দূরে এনে রেখেছি?

হঠাৎ বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দে আমার চিন্তার শৃঙ্খল ভেঙে গেল। কেউ ডাকবে ভেবে দু-চার মিনিট অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?' উত্তরে একটি সুডৌল গৌরবর্ণ হাত এগিয়ে পর্দাটা একটু নেড়ে দিল। ভীত স্ত্রীকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'ভেতরে আসতে পারি?' 'আসুন' বলার সময়ে আমার স্বরে একটি 'উদাসীন শিষ্টতার আভাস পেয়ে মেয়েটির' পা বাইরে একবার থমকে গেল। পরক্ষণেই কিন্তু নীল পর্দার পটভূমিতে একটি রঙিন চিত্রের মতো সে এগিয়ে এল।

গাঢ় সবুজ রঙের একটি পাতলা পশমের চাদরে বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা জমে ছিল। বৈদ্যুতিক আলোতে সেগুলি হীরকচূর্ণের মতো ঝলমল করতে লাগল। চাদর খুলে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের চেয়ারে গিয়ে যখন মেয়েটি বসল, তখন আমার বিস্মিত দৃষ্টি সেই মুখে কি খুঁজছিল জানি না। চোখের আশেপাশে যে ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলছিল, তাদের ডগায় জলের ফোঁটাগুলি পারার মতো দেখাচ্ছিল। শাদা শাড়ির বেগনি রঙের পাড়ে ঘেরা মুখখানি, ফরসা এবং সুন্দর অথচ ভারি শুকনো। লাল নাকের ডগা দেখে বুঝলাম, তখনই চোখের জল মুছেছে। সম্ভবত কেঁদে-কেঁদেই চোখের কোণছুটি ফুলে উঠেছে, তাতে ওর মুখের ভাব অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল। ঠোঁট এত শুকিয়ে যাচ্ছিল যে, বারবার ভিজিয়ে নিতে ওর যেন কষ্ট হচ্ছিল। আমি নিজে খুব ক্লান্ত ছিলাম বলে ও কিছু বলবে, এই প্রতীক্ষায় চুপ করে রইলাম।

কিন্তু ও যখন মাথা আরো নিচু করল, এক ফোঁটা চোখের জল কোলের ওপর পড়বার আগে আলোতে একটি উজ্জ্বল রেখার মতো দেখা গেল, তখন আমার খেয়াল হল, আমার সামনে বসা মেয়েটি না জানি কোন দুঃখের কথা আমাকে শোনাতে এসেছে। এত ঘনঘটা আর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যে ও ঘর থেকে বেরিয়েছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, ওর প্রয়োজনীয়তা কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না।

আমি আধো-ঘুমের জড়তা নিয়ে হয়তো অতি পরিচিত পুরনো প্রশ্নই কিছু করে থাকব। কিন্তু উত্তরে, 'আমাকে কিছু কাজ দিন,' শুনে যেন হঠাৎ জেগে উঠে সতর্ক হয়ে বসলাম। কাজ এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করা আবশ্যক, অথচ এ অবস্থায় সেটা একটু নিষ্ঠুর হবে মনে হল। আমার এ সমস্যার সমাধান কিন্তু ও নিজেই করে নিল। বলল, ও হিন্দি জানে আর গান জানে। ওর কথা আরো শুনলাম। ওর স্বামী দেড় বছর ধরে অসুস্থ। চিকিৎসায় সর্বস্ব

হারিয়েছে। গহনার শেষ চিহ্ন আছে ওর আঙুলে কেবল চারমাষা সোনার একটি আঙটি। স্বামীর একমাত্র উপহার হওয়ায় সেটা বিক্রি করার চিন্তাই ওকে দুঃখ দেয়। আর ওটা বেচেই বা কদিন চলবে? কাজ না পেলে ও নিজে না খেয়ে মরতে ভয় পায় না, কিন্তু……… বলতে বলতেই ওর গলা ভার হয়ে এল।

সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে মা-বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। শুনলাম, শ্বশুরবাড়ির লোক ওর ওপর বড় বিরক্ত, ওকে ঘরে নিতে রাজি নয়। স্বামীও একা ফিরে যেতে নারাজ। বিয়ের পর মায়ের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই। সেখান থেকে টাকা নেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

এই কথা শুনে ধীরে ধীরে আমি আসল কথার সূত্র খুঁজে পেলাম। যাদের পতিতা বলা হয়, সেরকম মায়েরই মেয়ে ও। অথচ সমাজে প্রবেশপত্র না পেয়ে সাধ্বী স্ত্রীলোকের মন্দিরে প্রবেশ করতে চায়।

সেই রাতে যে কতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই সমস্যা নিয়ে ভেবেছি, তা এখন মনে নেই। কিন্তু কোনো সমাধানে আসতে পারিনি। স্বামীর প্রতিষ্ঠা আর নিজের সম্মানজ্ঞান হারাবার ভয়ে ও কোনো দান নেবে না। অথচ কাজ দেবার কথা স্মরণ করে আমার হাসি পেল। ওর উপস্থিতিতেই যে কি অনর্থ হতে পারে, তা কি ও জানে?

দুদিন ধরে চেষ্টা করেও যখন ওর কোনো কাজের জোগাড় করতে পারলাম না, তখন আমি যা করলাম তা শুনলে লোকে বুঝবে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কত অজ্ঞ। কখনও এমন কোনো লেখা নকল করতে দিতাম যার কোনও দরকার ছিল না। আবার এমন সব চিঠি লেখাতাম হয়ত, যা পরে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িই ভরাত কিন্তু ওর দৃষ্টি সঙ্কোচে আরও অধিক নত হতে দেখে বুঝলাম, এই অভিনয়ের

সমস্তটা ও পরিষ্কার বুঝে গেছে। তারপর আর বেশিদিন এ ব্যবস্থা চালাতে আমি সাহস পাইনি।

অনেক দিন ওর কোনো খবর পাইনি। হয়তো সে সময়ে ওর স্বামীর রোগ বেড়ে গিয়েছিল। অবশেষে ওর পরিচিত এক মহিলার কাছে আমি এ গল্পের উপসংহার শুনতে পেলাম। খবরটি যদিও আমার মুখে-মুখে শোনা, তবু এতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম।

সেই অভাগিনীর একান্ত সাধনাও তার স্বামীকে বাঁচাতে পারল না। অন্তিম ক্ষণে পুত্রের মুখ দেখবার জন্য পিতা এলেন। কিন্তু তখনও অনাহারে দুর্বল, রাত-জেগে ক্লান্ত পুত্রবধূর মুখের দিকে ভুলেও তাকালেন না। ওঁর মনে এই ধারণাই ছিল যে বৌয়ের অনাচারের জন্য ছেলেকে মরতে হল।

পড়শিদের মধ্যে একজন যখন ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনল, তখন ওর মৃত স্বামীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারারাত ও তো ওভাবেই বসে রইল। কিন্তু সকাল বেলা যখন শ্বশুর চলে যাবার জন্য জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন, তখন যেন ওর চেতনা ফিরে এল। আঁচলে চোখ মুছে দরজার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কটার সময় যেতে হবে?'

শুনে শ্বশুর বেচারার মাথায় যেন বাজ পড়ল। প্রথমত আঘাত সহ্য করে তাঁর যখন কথা বলার শক্তি ফিরে এল, তখন তিনি নিষ্ঠুর আঘাত করলেন। বললেন, 'যা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, তা নিয়েই মায়ের কাছে ফিরে যাও। আমার কুলে কলঙ্ক দিয়েও কি তোমার যথেষ্ট হয়নি?'

ও রাগ করল না, মান-অপমানের চিন্তা করল না। যে ঘরে ওর ন্যায্য অধিকার, সেখানে একটু স্থান পাবার জন্য ও দীনতার সঙ্গে বলল, 'ঘরে তো আপনার চাকর-বাকরও আছে। আমাকে দুমুঠো খেতে দেবেন। আমি আপনাদের সকলের সেবা করব।'

কিন্তু শ্বশুর যা উত্তর দিলেন, তা লজ্জাকেও লজ্জিত করে দেয়। আমার কাছে এ খবর অনেক দেরিতে পৌঁছল। ওর খোঁজ করতে কেউ বলল, 'ও বিধবাশ্রমে চলে গেছে,' কেউ বা বলল, 'ওর মার কাছে ফিরে গেছে।'

সময় যখন ওর স্মৃতিকে কিছুটা ফিকে করে এনেছে, এমন সময় ময়লা খামে ভরা ওর এক চিঠি পেয়ে আবার সমস্তটা সজীব হয়ে উঠল।

ও ভাল আছে, আমাকে ভোলেনি। তবে আর কষ্ট দিতে চায় না। সেলাই, বোনা—ইত্যাদিতে এখন ওর কিছু রোজগার হচ্ছে।

আর জিজ্ঞেস করেছে, মেয়েদের জীবিকার উপায় শেখাবার জন্য আমি যে আশ্রম খুলতে চেয়েছিলাম, সেটা কবে খুলব।

অলোপী

অন্ধ অলোপীর ঘটনাশূন্য জীবনে প্রয়োজনীয়তার একটি পরমাণুও আছে কি না সে খোঁজ তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক করবেন। কিন্তু আমার নিজের কাছে ওর কাহিনী অশ্রুভরা দৃষ্টির ছায়ায় কম্পমান দুঃখ-গীতের একটি স্তবকের মত করুণ।

আমি যে ওকে দেখলাম সেই যোগাযোগটিও বড় চমৎকার। সেবার বৈশাখ নতুন গায়কের মত তার অগ্নিবীণার এক-একটি বিলম্বিত আলাপে সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করে তুলতে চাইছিল। আমার ছোট ঘরখানিও এক দিকে গাঁয়ের কুমোরের চুল্লির মত গরম হয়েছিল। আর অন্যদিকে হাওয়ায় দরজা জানালা অনবরত খোলা আর বন্ধ হবার শব্দে আধুনিক শহুরে কারখানার বিভ্রান্তি মনে আনছিল। আমি এই মুখর উত্তাপের উপযুক্ত কাজই করছিলাম। অর্থাৎ পরীক্ষার উত্তরের খাতায় জ্ঞান-অজ্ঞানের রাশিকে বিবেকের তাপে তপ্ত করে, তার মধ্য থেকে জ্ঞানকণাগুলির মূল্য নিরূপিত করছিলাম।

সত্যিই আমরা বড় অদ্ভুত জীব। যখন বরফ, খসখসের পর্দা, বিজলি পাখা ইত্যাদি কৃত্রিম উপচারেও নিজেদের বুদ্ধির তরলতা রোধ করতে পারি না—তখন অন্যের জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে বসি। যদি মস্তিষ্ক ঠিক অবস্থায় থাকত তবে আমরা কখনও ন্যায়ের জন্য এরকম অন্যায়পরায়ণ হতে পারতাম না।

ক্লান্ত যাত্রীর মত থেমে থেমে দিনের তৃতীয় প্রহর এগিয়ে আসতে লাগল। আর এদিকে আমার হাত আর দৃষ্টি উভয়ের মধ্যে পাতার পর পাতা দৌড়ে চলার প্রতিযোগিতা চলল। এ রকম সময়ে যে কোনো লোক এলে আমি একটু বিরক্ত হই। তার ওপর যদি আগন্তুকের কণ্ঠে ভিখিরির স্বর শুনতে পাই তবে তো আর কথাই

নেই। সেই সময় চাকর-বাকররা সব নিজ নিজ ঘরের অস্বাভাবিক অন্ধকারকে আরো সঘন করে স্বেচ্ছায় প্যাঁচা হবার সুখভোগ করছে। ভাবলাম উঠব না। অসময়ে আসার জন্য ওর দণ্ড পাওয়া চাই। কিন্তু ভিখিরি সম্বন্ধে আমার সংস্কার প্রায় অন্ধবিশ্বাসের কোঠায়। কারণ শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত মা কত রকম কাহিনী দিয়ে এই ব্যবহার-সূত্রটিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের শিষ্টতার পরীক্ষা তখন হয় না যখন কোনো মান্য অতিথি কৃপা করে আমাদের ঘরে আসেন। বরং সে সময়েই হয় যখন ভিখিরি দরজায় এসে আমাদের দয়ার কণাটুকু পাবার জন্য হাত বাড়ায়।

মায়ের জীবিত কালে এমন অনেক সময় গেছে যখন আমি আমার এই শিক্ষা মনে রাখতে পারিনি। কিন্তু যখন থেকে উনি অপ্রসন্ন হবার সীমা পার হয়ে গেছেন তখন থেকে আমার সেই ভুলে যাওয়া পাঠ তার সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে মনে আসতে লাগল।

ভিখিরির প্রয়োজনের চাইতেও আমার নিজের শিষ্টতার পরীক্ষার দিকেই আমার বেশি নজর ছিল। তাই নিরুপায় হয়ে উঠতেই হল। কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে সেই মূর্তি দুটি পত্রহীন দরিদ্র নিমগাছের কাছে ছায়া চাইতে গেছে। 'এ' 'ও' ইত্যাদি অপরিচয়-বোধক শব্দ শুনে বুঝল ওদেরই ডাকছি। কাছে আসতেই ওদের প্রতি আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। চামড়ার আবরণের মধ্যে অস্থিপঞ্জরগুলি বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। সেগুলির জন্য ছেঁড়া লম্বা কুর্তার কারাগার তৈরি করে ১০।১২ বছরের একটি বালক লাঠির একটি দিক ধরে সামনে চলেছে। আর খাটো ধুতি আর ময়লা জামায় নিজের কঙ্কালটিকে যথাসম্ভব মুক্তি দিয়ে একটি অন্ধ লাঠির অন্য দিকটা ধরে হাতড়ে-হাতড়ে ওর পেছন-পেছন চলেছে।

ফসলের ক্ষেতে লাঠির ডগায় উপুড় করা হাঁড়ির মত মাথা নেড়ে নেড়ে সেই প্রৌঢ় বালক বৃদ্ধ যুবককে কি বলল জানি না। কিন্তু

অন্ধটি যখন মুখ তুলে নমস্কার করল, তখন মনে হল নমস্কারের লক্ষ্য বুঝি সামনের খেজুর গাছ। জীবনে প্রথমবার প্রশ্নের উপযুক্ত শব্দের খোঁজে সেই দৃষ্টিহীনের সামনে মূক হয়ে রইলাম।

ধুলোর রঙের কাপড় আর ধুলোভরা পা দুটি তো ছিলই, তাছাড়া ওর ছোট চুল, চ্যাপ্টা কপাল, শিথিল বিরল পক্ষ্ম, পাতলা ঠোঁট—এসব দেখে আধ শুকনো ক্লে-মডেল ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। দৃষ্টিহীন ছোট ছোট চোখ ময়লা কাচের গুলির মত দ্যুতিহীন। আর তা দেখে সেই শরীরের নির্জীব মূর্তিমত্তার ভ্রান্তি আরো গভীর হয়।

এই কারণেই হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বর শুনে নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠেছিলাম। আমি জানি এদের জীবন খোলা বইয়ের মত দেখতে পাওয়া যায়, আর তুচ্ছতম অবসরেও এদের জীবনের সমস্ত কথা শুনে নেওয়া যায়। অন্ধ অলোপীর কথার মধ্যে মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা কিছুই ছিল না। আর ওর দৈন্যভরা বাচালতা দেখে বুঝেছিলাম, চক্ষুর অভাব ও রসনা দিয়েই পূর্ণ করেছে।

ওর পিতা কাছি (তরকারিওয়ালা) বংশাবতংস। অনেকদিন ভাবী বংশধরের অপেক্ষা করে অবশেষে যাচকের রূপে অলোপী দেবীর দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অলোপী দেবী যেন দানশীলা বলে খ্যাতি লাভের জন্যই শুধু দান করেন, যাচকের প্রয়োজন বুঝে নয়। তাই তাঁর মন্দির থেকে একটি অখণ্ড মূর্তিও বেরোয়নি। একটি ছেলে দিলেন চক্ষুহীন। মা বাপ তো তাঁর সেই দান তাঁরই চরণ তলে ফেলে আসার কৃতঘ্নতা দেখালেন না। কিন্তু বোধহয় তাঁর কৃপণতার ঘোষণা করে অন্য যাচকদের সাবধান করার জন্য ওর নাম রাখলেন অলোপীদীন।

সেই অলোপীদীন এখন তেইশ বছরের হয়ে গেছে। বাপ মারা গেছেন। মা তরকারি নিয়ে ফেরেন। কিন্তু জোয়ান ছেলে বসে থাকবে, আর মা খেটে-খেটে মরবেন এটা ছেলের ভাল লাগে না।

তাই শাক-তরকারির তত্ত্ববেত্তা পিসির কাছে এখানকার খবর পেয়ে ও কাজের খোঁজে বেরিয়েছে।

এমন অদ্ভুত কথা তো আমি জীবনে শুনিনি। কুলবধূদের মত সব সময় চাপা কান্নায় রত এমন অনেক যুবককে চিনি, যাদের পৌরুষ বাপের কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়াতে কুণ্ঠিত হয় না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতেও বিচলিত হয় না। নিজের পরাজয়কে বিজয় মনে করে এমন পুরুষও আছে যারা ঘরে বাচ্চা রেখে বাইরে দৈনিক পরিশ্রম করছে এমন পত্নীদের উপার্জনের পয়সায় সিনেমা-ঘরের শোভাবর্ধন করতে লজ্জা বোধ করে না।

খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখানে কি কাজ করতে পারবে?' অলোপী আগে থেকেই সব ভেবেচিন্তে এসেছে। ছাত্রাবাসের জন্য আর আমার জন্য ও ক্ষেত থেকে ভাল তরকারি নিয়ে আসবে। 'ও তো জীবনভর অন্ধ, এই ব্যবসা আরম্ভ করে তার গুরুতর কর্তব্য কি করে সামলাবে'—এই প্রশ্ন করার অবকাশ পর্যন্ত আমাকে না দিয়ে অলোপী ওর পিসতুত ভাই রঘ্ঘুর দিকে সঙ্কেত করে বলল, ওদের সম্মিলিত পুরুষার্থ কঠিনতম কার্য করতে সক্ষম।

প্রস্তাবটি অভূতপূর্ব। কিন্তু আমিও তো কম খেয়ালি নই। তাই রঘ্ঘু আর অলোপী তাদের দুর্বল স্কন্ধে এই গুরুভার নিয়ে ফিরে গেল। পর দিন সকালে এক হাতে রঘ্ঘুর লাঠির আগা ধরে, অন্য হাতে মাথার ওপরে বড় ঝুড়ি সামলে, 'মালিক বাড়ি আছেন?'—বলে অলোপী ডাকতে লাগল।

আমি কি কি খেতে ভালবাসি জানবার জন্য ও যখন অনুনয় বিনয় করতে লাগল তখন আমি খুব মুস্কিলে পড়ে গেলাম। কতকগুলি তরকারি ডাক্তার আমার পথ্যের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। আর বাকিগুলি সম্বন্ধেও এ নিয়ম ছিল; খাওয়ার ব্যাপারে ভক্তিনের

পছন্দই আমি মেনে নিতাম। তাছাড়া যাকে বছরে কয়েক মাস দই, কয়েক মাস ফল আর কয়েক মাস খিচুড়ি ইত্যাদি পথ্য করে কাটাতে হয়, রুচি সম্বন্ধে সে বীতরাগ তো হবেই। তবু অলোপীকে নিরাশ করব না ভেবে ও আমার জন্য যা যা এনেছিল, সব নিয়ে নিলাম। পয়সা দেবার সময় অলোপী বলল, মাসের শেষে নেবে। আমি যখন আমার ভুলে যাবার সম্ভাবনার কথা বললাম আর হিসেব লেখায় বিরক্তি প্রকাশ করলাম, ও তখন খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, ওর পিসি যখন প্রথম ভাগের বিদ্যে শেষ করেছে, হিসেবটা ওরা ঠিকই রাখবে। ছাত্রাবাসের মেট্রন ওখানকার হিসাব রাখবেন। সেখানে এই যুগলমূর্তি নিয়ে প্রথমটা একটু কৌতুকের কোলাহল উঠেছিল। অবশ্য দু-চারদিনের মধ্যেই আবার অলোপী সকলকার মমতার পাত্র হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানে ও যে রকম স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করত, অন্য চাকররা তা পারত না। মেসের নিকনো উঠনের কোনায় পা টেনে বসে মেপে আনা তরকারিগুলি ওখানকার বড় দাঁড়ি পাল্লায় আবার ওজন করতে বসত। ওর ওজনের জ্ঞান এত বেড়ে গিয়েছিল যে, লাউ, কুমড়ো-কাঁঠাল—এ সব হাতে নিয়েই ও ওজন বলে দিত। প্রায়ই ছোট মেয়েরা ওকে ঘিরে পাখির মত কিচিরমিচির করত। অলোপী ওদের জন্য পেয়ারা, কুল নিয়ে আসত, অথচ দাম সম্বন্ধে কিছু বলত না।

একদিন কলেজের ফলওয়ালা নালিশ করল, অন্ধ ফল এনে বাচ্চাদের দেওয়াতে ওর ব্যবসার হানি হয়। শুনে আমি অলোপীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। ও দাঁতে জিভ কেটে বলল, দাম তো ও পেয়েই যায়। তাছাড়া ও তো স্কুলের সময় আসে না। ফলওয়ালার ক্ষতি হয় কি করে?

মেয়েরা আমার কাছে মিথ্যে বলতে পারে না, তাই চুপ করে রইল। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনে ও ওর চাদরের খুঁটে চোখ মুছল। বলল, আট-নবছরের খুড়তুত বোনটি ওর মারা গেছে।

এ সব মেয়েদের গলা শুনে সেই বোনের স্বর বলে ভুল হয়। ওর দারিদ্র্যের অনুরূপ দু-চারটি পেয়ারা, কুল, জাম নিয়ে আসে। গ্রামে তো এসব জিনিসের কেউ কোনো দাম দেয় না। ও নিজে দাম দিয়ে কিনলে, দাম নিতে পারত। ওগুলো ও কেনেনি, তাই ঐ ফল বেচে পয়সা নিতে ওর ইচ্ছে করে না। অলোপীর কথা শুনে আমি আমার ন্যায়ের মাহাত্ম্য বুঝে চুপ করে গেলাম। এর পরে ওর সিদ্ধান্তে আর কোনো পরিবর্তন আনতে হয়নি, তা বোধহয় বলাই বাহুল্য।

ওর দৃষ্টিশক্তি না থাকাতেই হয়ত ও কখনও প্রকৃতির রৌদ্রমূর্তি দেখেও ভীত হত না, আর তার সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হত না। মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ে যখন বরফের তুফান ছোটাত, বিদ্যুতের শিখা যখন ফোয়ারার মত অগ্নিবর্ষণ করত, তখন রঘ্ঘু চলতে চলতে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলত। কিন্তু ভিজে ন্যাকড়ার পুতুলের মত অলোপীর নাকের ডগা দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে যে জল ঝরছে, সে চিন্তা না করে সে ভেজা আঙুলে লাঠি ধরে সবুজ ক্ষেতের একটি খণ্ড ঝুড়িতে ভরে এভাবে পা ফেলতে-ফেলতে চলে যেন আজই ওকে এ পৃথিবীর সঙ্গে পুরো পরিচয় করে নিতে হবে।

রঘ্ঘুর পা যদি একবার কাদায় পড়ে তো রক্ষে নেই। কারণ চক্ষুষ্মানের পথপ্রদর্শনে এ রকম ত্রুটি অলোপী সহ্য করতে পারে না। শীত যখন বরফের তারার ব্যূহ রচনা করে তখন রঘ্ঘু মৃগী রোগীর মত কাঁপতে-কাঁপতে দাঁত কিড়মিড় করে। কিন্তু অলোপী ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে কম্পমান ঠোঁটের কপাট রুদ্ধ করে ঠাণ্ডায় নীল পা যেন মেপে মেপে ফেলতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ধুলোর ঝড় দেখে মনে হয় কেউ যেন পৃথিবীকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে আর লু-দগ্ধ ব্যক্তির মত চিৎকার করতে করতে এই কোণ থেকে ওই কোণ পর্যন্ত দৌড়ে ফিরছে। সেই সময় রঘ্ঘু হাতে চোখ ঢেকে তাড়াতাড়ি পা ফেলে যখন চলে, আমার মনে হয় আগুনের খোলার মধ্যে বীচির নাচ

দেখছি। অথচ অলোপী যেন চোখের অন্ধকারকে ভিতরে বন্দী করে, ধৈর্যভরে প্রতিটি পা ধরিত্রীর ওপর ফেলে এভাবে চলে যে, দেখে মনে হয় ও এই পৃথিবীর হৃদয়ের তাপ ওজন করে নিতে চায়। বসন্তোৎসব কি হোলি, দশহরা কি দেয়ালি, কোনোদিনই অলোপীর নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

আমাদের হিন্দু-মুসলমান ভাইয়েরা নিজেদের অনেকদিনকার অকর্মণ্যতায় লজ্জিত হয়ে আবার একবার তাদের বীরত্বের প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশ নিতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে এক দিন অলোপী মস্ত এক ঝুড়ি ভরে তরিতরকারি নিয়ে আর রঘ্‌ঘুর পিঠে এক বড় গাঁঠরি চাপিয়ে নির্জন রাস্তা ধরে এসে উপস্থিত হল। ওর দুঃসাহসে বিস্মিত না হয়ে আমি বরং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। 'তুমি দেখেছি হৃদয়ের দিক থেকেও অন্ধ। এ রকম অন্ধকার গলিতে প্রাণ দিয়ে কিছু স্বর্গে যাবে না।'—এসব স্বাগত বাক্যের উত্তরে অলোপী বেগুন-লাউ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর আমার উঠোনে তরকারির টিলা নির্মাণ করে ছাত্রাবাসের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে ফিরে যখন ও শুকনো চোখ মুছে মুছে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, ততক্ষণে আমার রাগ পড়ে গিয়ে মনে মমতার সঞ্চার হয়েছে।

আমার কণ্ঠস্বরে আশ্বাস পেয়ে ও বলল, এবার দুদিনের তরকারি নিয়ে এসেছে। মেট্রন বলেছিলেন, ওঁর আচার, বড়ি ফুরিয়ে গেছে। কেবল ডাল দিয়ে তো ওদের মত লোকই খেতে পারে। তাই এসব জিনিস কিনে নিয়ে ও কোনো মতে এসে পৌঁছেছে। ওর মতো অন্ধকে আর কে মারবে? তবে অবশ্য আমার আদেশ না পেলে ও ঘরের বাইরে আর এক পাও দেবে না। এখন তো দুদিনের জন্য চিন্তা নেই। আর তারপরে ঝগড়াও মিটে যাবে। অলোপীকে সে সময় আমার ওখানে আটকে রাখা সম্ভব হল না। কারণ বুড়ি মায়ের রক্ষার ভারও তো ওর ওপরই ছিল।

আমি বারান্দায় থাকি কিনা তাতো অলোপী দেখতে পায় না—অথচ এমন কখনও হয়নি, আসতে যেতে সে দিকে ও নমস্কার না করে গেছে। খালি ঝুড়ি নিয়ে নিম গাছের তলায় বসে অলোপীকে ভক্তিনের সঙ্গে খুব মন দিয়ে কথা বলতে অনেকদিন দেখেছি। আলোচনার বিষয়ও কম গুরুতর নয়। আমি করলা ভালবাসি, না কাঁঠাল ভালবাসি, মেথিশাক আর পালংশাকের মধ্যে কোনটি আমার বেশি প্রিয়, কমলা আর বাতাবি—এ দুরকম নেবুর মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক—ইত্যাদি প্রশ্নের ওপর গম্ভীরভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে।

সে সময়কার একটি ঘটনা ক্ষুদ্র হলেও আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছিল। আমি জ্বরে পড়ে ছিলাম। কয়েকদিন আমার বারান্দাকে নমস্কার করে অলোপী রঘ্ঘুকে বলল, 'মনে হচ্ছে, এবার গুরুজি খুব রাগ করেছেন। আগের মত কিছু জিজ্ঞেসই করেন না।' কিন্তু যখন ও জানতে পারল, অসুখের জন্য আমি বাইরে আসতেই পারিনি, তখন খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

পরের দিন শুনলাম যে, অলোপী আমাকে দেখতে আসার অনুমতি চায়। কষ্টের মধ্যেও আমার হাসি পেল। ভাবলাম অন্ধ অলোপী অসংখ্যবার আজ্ঞা পেলেও আমাকে দেখবে কি করে? যা হক, ভিতরে এসে হাতড়ে-হাতড়ে চৌকাঠের পাশে তো ও বসে পড়ল। তারপর ওর শূন্য চোখের আর্দ্রতা হাত দিয়ে মুছে চাদরের এক কোনার গিঁট খুলতে-খুলতে অপরাধীর মত বলল, ও নিজে গিয়ে অলোপী দেবীর বিভূতি নিয়ে এসেছে। একটুখানি জিভে ঠেকিয়ে, একটু মাথায় লাগিয়ে নিলে সব রোগ-দোষ দূর হয়ে যাবে। আমার বলার ইচ্ছে হল, দেবী যখন তোমারই সর্বাঙ্গ পূর্ণ করতে পারলেন না, তখন আমার আর কি করবেন? কিন্তু কিছু বললাম না। কারণ অলোপী দেবীর দিব্যতা প্রমাণিত করার জন্য অলোপী-দীনের কর্তব্যজ্ঞানে

বজ্রের মত কঠোরতা আর মমতায় মোমের মত কোমলতাই পর্যাপ্ত। যার পরিচয় স্বরসমূহের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, তার প্রতি এতখানি মায়া, সত্যিই ভোলবার নয়।

তিন বছর ধরে অলোপী এখানে তরকারি বিক্রি করছে। শরীর একটু ভরা-ভরা হয়েছে, মাথায় যখন তখন পাগড়ি দেখা যায় আর ধুতিও খানিকটা নীচে নেমে এসেছে। সাধারণত মাসে সত্তর টাকারও কিছু বেশি তরকারি এখানে আসত। তার দাম দিয়ে আর রঘ্ঘুকেও কিছু দিয়ে অলোপীর কাছে যা থাকত তাতে মা ছেলের দিন স্থখেই কাটছিল। এক দিন তো রঘ্ঘু হেসে হেসে বলছিল যে দাদার টাকা তো ওর মা কিছু কিছু পুঁতে রাখতে শুরু করেছে।

অলোপীর অন্ধকার জীবনের উপসংহারও যাতে কম অন্ধকারময় না হয়, বিধাতাই তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একদিন আমার কাছে বসে নিজের মনে সংসারের কথা বলতে গিয়ে ভক্তিন শোনাল যে, অলোপী বিয়ে করছে। ওর কথায় সব সময় যেমন উপেক্ষা দেখাই, তা ভুলে গিয়ে আমি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলাম, 'কি!' ভক্তিন তখন এমন প্রসন্নভাবে আমার দিকে তাকাল, মনে হল কৃষ্ণকে রথের চাকা নিয়ে দৌড়তে দেখে ভীষ্মও নিশ্চয় এ রকম মুখের ভাবই করেছিলেন। শুনলাম ওর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

একটি তরকারিওয়ালী আগে তার দুই পতিকে মুক্তি দিয়ে এসেছে। সে এখন এই অন্ধের জন্য স্বর্গ রচনা করতে চায়। অথচ অলোপীর মা যে পুত্রকে দেবতার বরে পেয়েছেন, তাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে চান না।

গরমের ছুটির পর ফিরে এসে শুনলাম ; অলোপীর মা আলাদা হয়ে গেছেন আর বৌ এসে ঘর-দোর সামলাচ্ছে। তারপর ওকে একবার দেখার স্থযোগও হয়েছিল। লম্বায় মাঝারি ধরনের স্থগঠিত-দেহ একটি প্রৌঢ়া। দেখতে সাধারণ মত, অথচ কণ্ঠস্বরে এমন এক

আত্মীয়তাভরা আমন্ত্রণ ছিল যা সকলকেই আকৃষ্ট করত। আর বিশেষ উজ্জ্বল দুটি চোখে চালাকির সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটি কঠোরতা ঝিলিক দিয়ে যেত যে ওকে বিশ্বাস করা অসম্ভব না হলেও কঠিন হত। অলোপী ওকে কণ্ঠস্বর দিয়েই চিনত। তাই বোধহয় বিশ্বাস করেছিল। রঘ্‌ঘু বলত যে, ওর নতুন বৌদির মুখে টাকার কথা ছাড়া আর কথাই নেই। কখনও জানতে চায়, অলোপী কিছু টাকা পয়সা জমিয়েছে কিনা। আবার কখনও বা নিজের ঝুমকোগুলো কোন জায়গায় পুঁতে রাখবে ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অলোপী এই স্বর্গে ছমাস ছিল। এক দিন শুনলাম, ওর চতুর পত্নী সব কিছু নিয়ে ওকে মায়া পাশ থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। সে বেচারা তো অনেক দিন পর্যন্ত একথা বিশ্বাসই করতে পারল না। গর্তগুলো হাতড়ে-হাতড়ে দেখত আর বৌয়ের প্রতীক্ষায় বসে থাকত। পরোপকারী প্রতিবেশীরা যখন ওর বিশ্বাসের কঠিন শিলাকে যুক্তির মর্মভেদী বাণে উড়িয়ে দিল, তখন ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিসকে এ খবর দেবার আলোচনা শুনলেই বলত, নিজের স্ত্রীকে হুলিয়া দিয়ে ধরানো অত্যন্ত নীচ কাজ।

খানিকটা সেরে উঠে ও আবার তরকারি নিয়ে আসত। কিন্তু আগেকার সে উৎসাহ ওর মধ্যে আর দেখা যেত না। পা দুটো টেনে টেনে চলত, হাত থেকে লাঠি ছুটে ছুটে যেত। একবার আমার বারান্দার দিকে নমস্কার করার সময় ওর হাতের ঝুড়ি পড়ে যাচ্ছিল। অলোপীর সব সাহস, সমস্ত উৎসাহ আর সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস সংসারের একটি বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে ভেঙে গেল।

অন্ধের দুঃখ বোবা হয়েই আসে, তাই যারা সান্ত্বনা দেবে তারা ওর হৃদয় পর্যন্ত পৌছবার পথ পায় না। আমি কোনো কথা বলতেই ও লজ্জায় এমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে যে, আমি আর কিছু বলে ওর কষ্ট বাড়াতে চাই না। নিজের অপরাধ সম্বন্ধে অজ্ঞান আর অকারণ দণ্ডের

কঠোরতায় অবাক বালকের মত অলোপীর চারদিকে যে অন্ধকার ছায়া ঘিরে থাকত, তা আমাকে চিন্তিত করে দিত। ওর মা অনেক কষ্টে পাওয়া অন্ধ ছেলের সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু জেদী ছেলে নিজেকে নিজে ক্ষমা করেনি। তাই তাদের দুজনের করুণ মধুর অতীত আর ফিরে এল না।

সেবার আমি দশহরার ছুটি ঘরে বসে কাটাচ্ছিলাম। একদিন তরকারি নিয়ে এসে অলোপী সন্ধ্যা পর্যন্ত মেসেই বসে রইল। কখনও খুব মমতাভরে দাঁড়িপাল্লা ছুঁয়ে দেখছে, কখনও খুব স্নেহভরে পুষির ধনুকের মতো পিঠে হাত বুলচ্ছে, কখনও মজা করে ছোটো মেয়েদের খ্যাপাচ্ছে। যাবার সময় আবার আমার কুকুর ফ্লোরাকে চাদরে বাঁধা মুড়ি খানিকটা দিয়ে, হরিণী সোনাকে মূল পাতা খাইয়ে আর আমার বারান্দাকে নমস্কার করে সেই যে গেল, আর ফিরল না।

তার দুদিন পরে রঘ্ঘু কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে এসে খবর দিল, ওর অন্ধ দাদা ওকে না নিয়ে কোন অজ্ঞাত লোকে মহাযাত্রা করেছে। এ রকম হঠাৎই একদিন ও এখানে এসেছিল, তাই বিশ্বাস হয়, সহজেই আপন গন্তব্যস্থলে ও পৌঁছে যাবে।

বালক রঘ্ঘুর জন্য অন্য কাজের ব্যবস্থা করে আমি অলোপীর স্মৃতির ওপর যবনিকা টেনে দিলাম। কিন্তু আজও চৌকাঠের দিকে তাকাতেই আমার চোখের সামনে এক ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সেই ছায়া-ঢাকা মুখ স্পষ্টতর হতে থাকে। তাতে কাচের গুলির মত নিষ্প্রভ চোখ আর তোবড়ান গালের ওপর শুষ্ক অশ্রুর রেখাও আমি দেখতে পাই। তখন নিজের চোখ রগড়ে-রগড়ে আমি ভাবি, নিয়তির ব্যঙ্গে যে জন্মলাভ করেছিল আর সংসারের ছলনায় যার মৃত্যু হয়েছিল, সেই অলোপী কি আমারই মমতার লোভে প্রেত হয়ে হয়ে ঘুরবে ?

বদলু

বদলু ছিল ওর বেডৌল ঘড়াগুলির নির্বিকার নির্মাতা, এবং অষ্টাবক্রের মত রূপরেখাবিশিষ্ট ওর শিশুসন্তানগুলির নিশ্চিন্ত বিধাতা।

আমি ওকে সর্বদা দেখেছি, এক দিকে কাঁচা আর পোড়া মাটির ভাঙা আর আস্ত বাসনের স্তূপের মধ্যে বসে, আর অন্য দিকে রোগা, ন্যাংটো, নোংরা বাচ্চাগুলি ওকে ঘিরে রয়েছে—এ অবস্থায়। যেমন মাটির বাসন কিছু শুকোতে গিয়ে, কিছু পোড়াতে, কিছু তুলে রাখতে গিয়ে ভেঙে ভেঙে যায়, তেমনি বাচ্চারাও কেউ জন্মাতেই, কেউ বা হামা দিতে শিখে, আবার কেউ বা হাঁটতে আরম্ভ করে মা-বাবার কাজে সাহায্য করতে করতেই মারা যেত। অথচ এদের জন্ম-মৃত্যু ব্যাপারে বদলুকে কখনো সুখী বা দুঃখিত হতে দেখিনি।

বদলুর ছবি আঁকা কোনো চিত্রকরের পক্ষেই সহজ নয়, কারণ ও এমন সব পরস্পরবিরোধী রেখায় গড়া যে, তার একটিকে স্পষ্ট করতে গেলেই অন্যটি লুপ্ত হয়ে যাবে। ওর মুখের রঙ শামলা, আর তাতে একটা সৌম্যভাব ছিল। তোবড়ান গালের ওপরটায় নাকের দুপাশে উঁচু হাড় দুটি দেখে ওকে কঙ্কাল বলে মনে হত। লম্বা একহারা শরীরও কখনও হয়ত সুডৌল ছিল, এখন নিশ্চিত আকাশ-বৃত্তি অবলম্বনে অসময়ে বৃদ্ধত্বের ভারে নুয়ে পড়েছে। উজ্জ্বল ছোট চোখ স্ত্রীলোকের চোখের মত সলজ্জ অথচ উৎসাহহীনতার জন্য চকচকে কালো মাটির মূর্তিতে কড়ির চোখের মত নিষ্প্রভ দেখায়। কম্পমান ঠোঁটের মধ্য থেকে যখন খড়খড়ে গলার স্বর শোনা যেত, তখন মনে হত বাঁশির মধ্য থেকে যেন শাঁখের আওয়াজ বেরচ্ছে।

বদলু স্বভাবতই মিতভাষী, আর তাছাড়া আমার মত নাগরিকের শ্রবণসীমায় অনভিজ্ঞ। তাই ওকে কিছু বলার বা ওর কাছ থেকে

কিছু শোনার অবসর কমই হয়েছে। ওপথ দিয়ে যাবায় সময় যদি কখনও ঘুরন্ত চাকের ওপর ওর স্থির আঙুলগুলির কসরৎ দেখার জন্য দাঁড়াতাম, তবে ও একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। বারবার কেশে, গলা পরিষ্কার করে, খেদন, দুখিয়া, নাথু—এদের ডেকে মচিয়া আনতে বলত। চালুনির মত ঝরঝরে, সাড়ে তিন পায়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই মচিয়াটিকে অন্ধকার ঘর থেকে উদ্ধার করার জন্য বাচ্চারা কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলে, আমি ওখান থেকে বিদায় নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করতাম। কারণ আমি ওর ওপর বসলে সেই মচিয়ার কুশল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ তো ছিলামই, তাছাড়া ওসব হাঁড়ি-কুঁড়ির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার আশঙ্কাও ছিল।

বদলুর বাড়ি আমার আসা-যাওয়ার পথে পড়ে। তাই সেদিকে যাবার সময় সর্বদা আমার তাড়া থাকে, হয় বাড়ি ফেরার, নয় কাজে যাবার। সেখানে যাবার অবসরই তাই পেতাম না। অবশ্য যে দিন রাধিয়া ওর ঘরের দরজায় বসে মাটি মাখত, কি ঘরের অন্য কোনও কাজ করত, সেদিন আমাকে দাঁড়াতেই হত। কখনও চোখের জলে, কখনও হাসিমুখে ওর একঘেয়ে জীবনের কথা শোনাতে ও ভালবাসত। ওর চোখ দুটি, ঠোঁট দুখানি, হাত, পা—সবই যেন নিজের নিজের কথা শোনাতে ব্যাকুল। তাই কথা ওকে অল্পই বলতে হত অথচ তা এতখানি মর্মস্পর্শী হত যে, ও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতে পারত না। কোনো করুণ রাগিণীর সুরের মত ওর কথা যতখানি ওর নিজের, ততখানি শ্রোতারও হৃদয় মন্থন করত। তাই অনেক সময় আমিও আমার মনের আবেগ সেই কুমোর বৌয়ের কাছে লুকোতে পারি নি।

রাধিয়াকে মূর্তিমতী দীনতা বলা যায়। পুরনো শাড়ির ময়লা পাড় ছিঁড়ে পরবের দিনে হয়তো চুল বেঁধেছে, কিন্তু কখনও সর্ষের তেল লাগিয়ে সে চুলগুলি একটু মসৃণ করতে পারেনি। শাড়ি

ধুলোভরা, আর এতোই জীর্ণ সেটা যে ঘোমটা টানতে গিয়ে আঙুলের সঙ্গে সঙ্গে পাড়টি ছিঁড়ে নাক পর্যন্ত চলে আসে। এক-এক সময় দুঃখই এক রকম শৃঙ্গারে পরিণত হয়। তাই দুঃখী'ব্যক্তির মুখও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মনে হয়, রাধিয়ার মুখেরও বিশেষ আকর্ষণ ছিল ওর দুঃখ। নয়তো আলাদা করে দেখতে গেলে মুখ বেশি চওড়া, নাকটি যেন দুচোখের মাঝখানে একটি তীক্ষ্ণ রেখা টেনে ঠোঁটের ওপরটায় গোল হয়ে গেছে। গভীর কালো রঙে ঘেরা দুটি চোখ দেখলে মনে হয়, কেউ যেন আঙুল দিয়ে চেপে চোখ দুটিকে কাজলে ডুবিয়ে দিয়েছে। কোঁচকানো দুটি ঠোঁট দেখে মনে হয়, তিক্ত ওষুধের পেয়ালা নিরন্তর স্পর্শ করবারই চিহ্ন ওটা। এ সব বিষমতার সমষ্টির মধ্যেও যে এক বিশেষ আকর্ষণ ওর ছিল, তা অবশ্যই রাধিয়ার দুঃখ-বিগলিত চিত্ত থেকেই উৎপন্ন। জীবনের রসে ও যতখানি রিক্ত, দুঃখে ভিজে ততখানিই ভারী হয়ে উঠেছিল। তাই ওর মধ্যে সে শূন্যতাও ছিল না যা মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, আবার সেই লঘুতাও ছিল না যা হৃদয়কে স্পর্শ করার শক্তি রাখে না।

কাঁসার বালা দুটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, গালার চুড়ি-গুলিও ময়লা জমে আকারহীন হয়েছে। এ ছাড়া অন্য গয়নার সঙ্গে কিন্তু রাধিয়ার পরিচয়ই ছিল না। অথচ তার জন্য ওকে কখনও ক্ষুণ্ণ দেখিনি। সেই সুগঠিতা স্ত্রীলোকটি দারিদ্র্যের চাপে আর সন্তান জন্মের অটুট শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেল। তাকে চলতে ফিরতে দেখলেই মনে বিস্ময় জাগত।

এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে এক প্রকার কর্কশ প্রগল্‌ভতা দেখা যায়, রাধিয়ার মধ্যে মোটেই তা ছিল না। সম্ভবত সেই জন্যই ওর প্রতি আমার উদাসীনতা প্রথম কৌতূহলে এবং পরে সম্মানে পরিণত হয়েছিল। বদলুর প্রতি ওর ভালবাসা অত্যন্ত গভীর এবং

সেই কারণেই প্রকাশহীন ছিল। রাধিয়ার বিশ্বাস, ওর স্বামী কুম্ভকার শিরোমণি আর খুব বড় কলাবিদ্। ওর গুণপনার সঙ্গে এখনও সবাই পরিচিত হয়নি।

সকালবেলা উঠে কখনও ভুট্টা, কখনও বাজরা, কখনও যব, ছোলা ইত্যাদি পিষতে বসে ওর দিনের কাজের যে আরম্ভ হত, তার শেষ হত যখন প্রদীপের মৃদু, ধোঁয়াটে আলোতে কয়েকটি ঘুমন্ত, আর কয়েকটি ক্রন্দনরত শিশুকে সকাল বেলাকার তৈরি রুটি খাওয়াতে বসত। শিশুরা জীবিত আছে পাঁচজন অথচ রাধিয়া তাদের সংখ্যা বলার সময় মৃতদেরও বাদ দেয় না। মৃত তিনটি শিশুর কথা জীবিতদের সঙ্গে যেভাবে মিশে যায়, শুনলে তাদেরও জীবিত বলে মানতে হয়। তফাৎ কেবল এই, মৃত যারা তারা তো গল্পের নায়কের মত বায়বীয় স্থিতিতে জীবিত ছিল; আর জীবিত যারা তারা তাদের কলাবিদ্ পিতা আর মজুরনি মায়ের সাহায্য করতে করতে মারা যেত।

মাটি খোঁড়া থেকে আরম্ভ করে হাটে বাসন পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজে তাদের দুর্বল নগ্ন শরীর এভাবে প্রয়োগ করত যাতে ওদের প্রাণটুকু কেবল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অজুহাত না পায়। সব চেয়ে ছোট চার পাঁচ বছরের নাথু যখন নিজের বড় পেটের চেয়ে দ্বিগুণ বড় হাঁড়ি মাথায় নিয়ে হাটে যাবার উৎসাহ দেখাত, তখন তার পৌরুষ দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেতাম না। বাসন বিক্রির টাকায় সংসার চলত না, তাই শুধু জন্মজাত ব্যবসায়ে জীবিকার সমস্যা মেটে না দেখে রাধিয়া আশেপাশের খেতে কাজ করতে চলে যেত। কোনো কোনো দিন বদলু হাট থেকে, আর ও খেত থেকে ফেরার আগেই ছোট ছোট শিশুগুলি যেখানে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। রাধিয়া ফিরে এসে এদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে পুরনো ময়লা কাপড়ের বিছানায় এক সারিতে শুইয়ে দিত। সে সময়

যেটি জেগে উঠত, তাকে শিকের ওপরকার হাঁড়ি থেকে রুটির একটি টুকরো দিয়ে দিত। আর যারা ঘুমিয়ে থাকত, স্নেহভরা চাপড় খেয়েই তাদের কাটাতে হত।

বদলুও সেই হাঁড়ির প্রসাদ পেত, অথচ এই সীমিত অন্নকোষের অন্নপূর্ণা যিনি, তাঁকে যে ঘুম দিয়ে তাঁর নিত্য একাদশী ব্রতের পারন কোন দিন না করতে হত, বলা কঠিন। দুটি লোকই ছিল অতি বিচিত্র। স্বামী খাবার জোটাতে পারত না, বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারত না, শিশুগুলির ভবিষ্যৎ কি বর্তমানের চিন্তা করত না, অথচ স্ত্রী তার দোষকে দোষ মনে করত না। অসন্তোষের কোন কারণই খুঁজে পেত না।

রাধিয়ার কোনো বাচ্চার জন্মের সময়ে কোনো রকম গণ্ডগোল শোনা যেত না। ছোট্ট লখার যে-রাতে জন্ম হল, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাধিয়াকে বড়ো ঘড়া ভরে জল তুলতে দেখেছি। ঘড়া রেখে ও সেই চিরপরিচিত সাড়ে তিন পায়ার মচিয়া এনে দিল। খুব সতর্কভাবে তার ওপর বসে বাচ্চাগুলির সঙ্গে যখন কথা বলতে শুরু করেছি, তখন রাধিয়া ওর ধারপড়া কাস্তেখানা নিয়ে চবুতরার নীচে একটা পাথরের টুকরোর ওপর ঘষে-ঘষে সেটা ধুতে লাগল। আমি বিস্ময়মিশ্রিত উপহাসের স্বরে বলে উঠলাম, 'রাতে আবার এটা কি কাজে লাগবে ? কারুর গলা কাটবে নাকি ?' উত্তরে রাধিয়া ম্লান মুখে হাসল।

পরের দিন সোমবতী অমাবস্যার ছুটি ছিল, তাই ওদের ওখানে গেলাম। বদলুর চাক সবসময়ের মত উদাসভাবে গতিশীল, আর বাচ্চারা সব দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে দেখলাম। আমি সঙ্কোচে বদলুর দিকে না তাকিয়ে দুখিয়াকে ওর মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা ওই বলত। তাই এক-এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে চলল। ওর নতুন ভাই

হয়েছে। চামার কাকি এক টাকা চেয়েছিল বলে মা ওকে ডাকতে দেয়নি। নিজেই নাড়ি কেটেছে। ভাই চোখ বুজে শুয়ে আছে। বাবা মাকে বাজরার রুটি খেতে দিয়েছে।—এরকম সব খবর জেনে গেলাম। ভিতরে তাকিয়ে দেখার একবার নিষ্ফল চেষ্টা করলাম। মলিন বস্ত্র জড়ানো শ্যামাঙ্গিনী রাধিয়া মাটির দেয়ালে ঘেরা অন্ধকার ঘরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আমাদের ভাবী কুম্ভকারকে দেখার আমন্ত্রণ পেয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

ঘরের ভিতর ধোঁয়া আর তামাকের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। উনুনের কাছাকাছি এক কোণে চালডাল রাখার কালো হাঁড়ির পাশে ঝকঝকে থালাবাটি দেখে মনে হল যে জেলের কঠিন প্রাচীরের মধ্যে 'এ' ক্লাস আর 'ডি' ক্লাসের কয়েদিরা এক সঙ্গে বাস করছে। ঘরের মাঝখানটায় গৃহস্বামীর দোলনার মত খাটিয়া লম্বায় এত ছোট যে, ওর পা দুটি কোথায় রাখে তার ঠিক নেই। দেয়ালের মধ্যে গর্তের মত একটি তাক। বহুকালের উপেক্ষিত ধূলি ধূসরিত প্রদীপটি যেন নিজের নামের লজ্জা রাখবার জন্য এক ইঞ্চি প্রমাণ সলতে আর দুফোঁটা তেল কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এই ঘরের পশ্চিম দিকের খালি কোনায় রাধিয়া ওর নবজাত শিশুকে জীবনের শুরুতেই দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছিল। চোখ বোজা শিশুটিকে দেখাচ্ছিল যেন কোনও বড় পাখির ডিমের থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা ছানা। যেখানটায় নাড়ি কাটা হয়েছিল, সেই জায়গাটায় রক্ত জমে গেছে।

আমি ওর জন্য এখনই দুধের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি শুনে রাধিয়া করুণ হেসে যা বলল, তার অর্থ হল, আমি আর কত দিন এর ব্যবস্থা করব। এ সমস্যা তো ওর জীবনভর লেগে থাকবে। চাকের পাশে বদলু বসেছিল। ওকে ডেকে যখন গুড়, ঘি, শুঁট—এসব আনতে বলে দিলাম, তখন যেন ও আকাশ থেকে পড়ল। দুখিয়ার মা তো

বলল, 'গুড় দেখেই ওর বমি আসে, ঘি খেলে পেটে ব্যথা হয়'—তাই তো বাজরার রুটি দিয়ে ও নিশ্চিন্ত ছিল।

বদলুর সরল মুখের দিকে তাকিয়ে যখন আমি নিজের মিথ্যার অপরাধে লজ্জিত রাধিয়ার দিকে তাকালাম, তখন সেই দম্পতিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না। বদলু যে জিনিসের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাই যে রাধিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর তা বুঝতে আর দেরি হল না। তবু তা না বোঝার ভান করে বলে ফেললাম, 'যা সব মেয়েরা খায়, দুখিয়ার মাকেও তা খেতেই হবে, তাতে বমিই আসুক আর পেট ব্যথাই হক।'

সেই বাড়িতে সন্তান জন্মাবার সময়ও যেমন আড়ম্বর ছিল না, তার মৃত্যুতেও কোনও গোলমাল শোনা যেত না। মুলিয়া খুব জ্বর গায়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। গায়ে বসন্ত বেরোবার পর বড় ভাই ধরে নিয়ে ঘরের অন্ধকার কোনায় ভাঙা খাটিয়ায় শুইয়ে দিল। নিমগাছে দেবীর নামে জল দেওয়া, আর যা যা কর্তব্য রাধিয়ার বিশ্বাস আর সাধ্যের মধ্যে ছিল, তার পালনে কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু তবু চতুর্থ দিনে সে পরমধামে চলে গেল। মেয়েটির ওপর বাপের বড্ড বেশি মায়া ছিল। তাই বদলু যখন যমুনার জলে মেয়েকে বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরে এল, তখন রাধিয়া ওকে একটি স্বপ্নের কথা বলল। স্বপ্নে দেবী বলেছেন, 'এই মেয়েটিকে অল্পদিনের জন্যই তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এখন ওটিকে আমায় ফিরিয়ে দাও।'

বদলুর মত লোক স্বপ্নের কথায় প্রভাবিত হবেই। দেবী স্বয়ং যখন মুলিয়াকে নেবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন, তখন ওষুধপত্র দিলেও মেয়ে বাঁচত না। তার ওপর দেবীর কোপ সহ্য করতে হত। অথচ ওই মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হতে পারে যে, স্বয়ং মা ওর জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন ?

একবার আমি রাধিয়াকে মিথ্যা বলা সম্বন্ধে খুব সারগর্ভ উপদেশ

দিয়েছিলাম। তখন ও ছেঁড়া আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে যা বলল, তার গুরুত্বও কিছু কম নয়। ওর স্বামী তো ভোলামানুষ। অথচ ওর হৃদয় এত কোমল যে ছোট ছোট আঘাতে ধৈর্য হারিয়ে বসে। এমন অবস্থা নয় যে, এতোগুলি প্রাণীর দুবেলা আহারের ব্যবস্থা ও করতে পারবে। রাধিয়া তাই ওর নিজের আর বাচ্চাদের অসুবিধা-গুলি চেপেই যায়। এখন ভগবান ওকে পরলোকে যে দণ্ডই দিন, ও কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করার জন্য কখনো মিথ্যা বলেনি।

রাধিয়ার এই উত্তরই তখন আমার কাছে প্রশ্ন হয়ে উঠল। ওর অসত্যকে কি অসত্য বলা যায়? আর তাই যদি না বলি, তো তাকে আর কি বলব?

বদলুকে অনেকবার বলেছি যে এ রকম বেডৌল হাঁড়ি না করে নকশাদার কুঁজো তৈরি করে ও শহরে বিক্রি করতে পারে। চাকের দিকে চোখ রেখে সেই খড়খড়ে গলায় উত্তর শুনেছি, ওর বাপ-দাদা চিরজীবন এই রকম ঘড়াই গড়েছে। ও গাঁয়ের কুমোর, শহুরে বাসন গড়া ওর কর্ম নয়। বেশি কিছু বলা বৃথা মনে করে চুপ করে গেছি।

একদিন আমি বাচ্চাদের পৌরাণিক কাহিনী শোনাব বলে কয়েকটি ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলি নিপুণভাবে আঁকা না হলেও বাজারে যে শিব, পার্বতী, সরস্বতীর ছবি বিক্রি হয়, তার চেয়ে অনেক ভাল ছিল। বদলুর বাচ্চাদের মধ্যে দুখিয়াই কেবল পড়তে আসত। সম্ভবত ওই বাপকে খবরটা দিয়ে এসেছিল। বদলু যখন ওর সমস্ত গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে নিজে ছুটে এল, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি ওকে সব ছবিগুলি দেখালাম। আর তাদের অর্থও যথাসম্ভব সরল করে বুঝিয়ে দিলাম। অথচ তবুও বাচ্চাদের সঙ্গে ও বসেই রইল।

সরস্বতীর ছবির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখে বললাম, ‘এটা কি তুমি

নিজের কাছে রাখতে চাও?' ওর দৃষ্টিতে সঙ্কোচ ছিল, বোধহয় ভাবছিল এত সুন্দর ছবি কি করে চাওয়া যায়? ওর মনের ভাব বুঝে ছবিখানা যখন ওকে দিয়ে দিলাম, তখন আনন্দের আতিশয্যে ও শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠল।

কয়েকদিন পর সেই অন্ধকার ঘরের জীর্ণ দরজায় সরস্বতীর ছবিটিকে লেই দিয়ে আটকানো দেখে আমার মনে ক্ষোভ এল।

প্রতি বছর দেওয়ালির দিনে আমি অনেক রকম মাটির খেলনা কিনি। বাস্তবিক এ ধরনের উৎসবে মৃত্তিকা শিল্পীদের কারিগরির প্রদর্শন ভাল ভাবে হয়। আর ওরাও উৎসাহ পেয়ে বছরভর নিজ নিজ কলাসৃষ্টির বিকাশের দিকে যত্নবান হয়। আধুনিক সভ্যযুগ আমাদের উৎসবগুলির উৎসাহই যে শুধু কেড়ে নিয়েছে তা নয়, এই শিল্পীদের বিকাশের পথও রুদ্ধ করে দিয়েছে।

খেলনা সাজাবার জন্য যখন আমার বড় ঘরে গেলাম—তখনই বাইরে বদলুর খড়খড়ে কণ্ঠ শোনা গেল। ও তো কখনও আমার এখানে আসে না। তাই অবাকও হলাম, আবার চিন্তিতও হলাম। ওর ঘরে কি তবে কারো অসুখ করল বা অন্য কোনও বিপদ হল? বারান্দায় এসে দেখি, ময়লা কাপড় পড়ে সঙ্কুচিত হয়ে বদলু একটা ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খানিকটা এগিয়ে এসে ও যখন ঝুড়ি সামনে রেখে তার ওপর ঢাকা দেওয়া ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো সরিয়ে দিল তখন আমি একেবারে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বদলু একটি সরস্বতীর মূর্তি নিয়ে এসেছে। শাদা আর সোনালি রঙে সেটি চিত্রিত।

মূর্তিটির শুভ্র বস্ত্র, সোনালি চুল, সোনালি বীণা, লাল ঠোঁট আর পা-ওয়ালা শাদা হাঁস তার প্রশান্ত ভাবটিকে আরো সৌম্য করে তুলেছে। এক একটি চুলের গোছা যেরূপ নিপুনভাবে তৈরি হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে যে একটি কুশল শিল্পীর হাতে সেটি গড়া। জিজ্ঞেস

করলাম, 'কার কাছ থেকে এটা গড়িয়ে আনলে?' উত্তরে যা শুনলাম, তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বদলু সলজ্জ চোখ নিচু করে আর শুকনো বেডৌল হাত বাড়িয়ে বলল, ও নিজেরই হাতে গড়েছে। বিশ্বাস করা সহজ হচ্ছিল না বলে আমি একবার মূর্তিটির দিকে আর একবার বদলুর দিকে তাকাতে লাগলাম। ওকি সেই একই কুমোর যে এক বছর আগে সুন্দর ঘড়া গড়া সম্বন্ধে নিজের অসামর্থ্য প্রকাশ করেছিল? মুখ থেকে বেরিয়েই গেল, 'তুমি তো গাঁয়ের কুমোর, নক্‌শাকাটা ঘড়া তৈরিও তোমার অসাধ্য। আর এখন এই মূর্তি গড়াবার কল্পনা কি করে তোমার মাথায় এল?'

ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। সরস্বতীর চিত্র দেখতে দেখতে বদলুর মনে শিল্পী হবার ইচ্ছে জেগে উঠল। ওর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সেই চিত্রগত সৌন্দর্যকে মাটিতে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। বহুবার নিষ্ফল হয়েছে। অবশেষে আজ সরস্বতীর এই প্রতিমা ও গড়তে পেরেছে যা আমাকে উপহার দেবারই যোগ্য হয়েছে।

তার পর কত দেয়ালি এসেছে। বদলু কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়েছে, আর তার মধ্যে অনেকগুলি বহু সম্পন্ন ঘরের গৃহসজ্জায় পরিণত হয়েছে।

সরলা রাধিয়া যেন নিজের স্বামীটিকে শিল্পী করে গড়ে তোলার চেষ্টায় জীবিত ছিল। যখন বদলুর বেডৌল হাঁড়ির জায়গায় সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি বসতে লাগল, তখনই যেন ও নিজের সমস্ত মমতা গুটিয়ে নিয়ে কোন এক অজ্ঞাত লোকের দিকে প্রস্থান করল।

বদলুর এমন দশা হল যেন চখাচখীর জোড়ের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেন ও রাধিয়ার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকত।

প্রতীক্ষা ব্যাপারটাই করুণ, তাতে আবার যখন একটি জীবিত মনুষ্য অন্য একটি মৃত মনুষ্যের প্রতীক্ষায় থাকে, যে আর কখনও ফিরবে না, তখন প্রতীক্ষা হয় করুণতম। মিথ্যাবাদী রাধিয়া তার স্বামীর মনের কতখানি স্থান রিক্ত করে গেছে তা তখনই বোঝা গেল, যখন নতুন করে সংসার পাতবার কথায় ও একজনের মাথায় হাঁড়ি ছুঁড়ে মারল।

স্ত্রীলোকের মধ্যে মায়ের রূপই সত্য, বাৎসল্যই শিব, আর মমতাই সুন্দর। সে যখনই এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে পুরুষের জীবনে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তার রিক্তস্থান পূর্ণ করা অসম্ভব না হলেও কঠিন হয়ে পড়ে।

অবশেষে তেরো বছরের দুখিয়া ওর ছোট শাড়ির আঁচলের ছায়ায় বাপ আর ছোট ভাই-বোনেদের আশ্রয় দিল। রাধিয়ার প্রতিরূপ হয়ে ওরই মতন সকলের দেখা শোনার ভার নিজে নিল।

বদলুর হাতের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ওর এক মামাত ভাই ওকে আর বাচ্চাদের ফয়জাবাদে নিয়ে গেছে, সেও দুবছর হয়ে গেল। দেয়ালির দিনে একটি মূর্তি নিয়ে আসতে বদলু কিন্তু কখনও ভোলেনি। এই বছরই কেবল সেই নিয়মে ব্যতিক্রম হল। কারণ দেয়ালি এসে চলে গেল, বদলু এখনো কোনো মূর্তি নিয়ে এল না। হয়ত বা রাধিয়ার খোঁজে ও চলে গিয়েছে। অথচ আমার ঘরের কোণে কোণে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ, বুদ্ধ, সরস্বতী, বাপু এঁদের মূর্তিগুলি পুরনো চাকের ওপর বেডৌল ঘড়া গড়তে ব্যস্ত কুম্ভকারের কথা অমাকে মনে করিয়ে দেয়। আর আমি বসে বসে ভাবি, কলা বা কল্পনা কোনো বিশেষ লোকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ক্ষমতা বা সম্পত্তি নিশ্চয়ই নয়।

লছমা

বারবার ধোয়াতে রঙ-ওঠা, পুরনো কালো ঘাগরাটিকে অদ্ভুতভাবে পরে, ছেঁড়া ময়লা ওড়নার কয় ফেরতা কোমরে জড়িয়ে, ডানহাতে একখানা বড় কাস্তে নিয়ে লছমা ঘাসপাতার স্তূপের ওপর লাফিয়ে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। কিছুটা পাহাড়ি আর কিছুটা হিন্দি মিশিয়ে বলল—'আমার জন্য কি তুমি ভয় পাও ? আমি কি আর তোমাদের মত মানুষ ? আমি তো জানোয়ার। দেখো না এই আমার হাত-পা আর এই আমার কাজ।'

মুক্ত হাসিতে ভরা এই পাহাড়ি যুবতীকে কেন যে আমার এত ভাল লাগে জানি না।

রোদে ঝলসান মুখ দেখে মনে হয় কেউ যেন কাঁচা আপেলটিকে আগুনের আঁচে রেখে পাকিয়ে নিয়ে এসেছে। শুকনো চোখের পাতার নীচে টলটলে চোখ দুটি—দেখে মনে হয় তারা অশ্রুর অথই জলে সাঁতার কাটছে। অথচ তাদের ওপরের পাতা দুটি যেন হাসির রোদে শুকিয়ে গেছে।

ঠোঁট দুখানি ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে, শাদা দাঁতের পাশে তাদের নীলিমা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। রাতদিন কঠিন পাথরের ওপর দৌড়ে দৌড়ে ঘাস কেটে আর লকড়ি ভেঙে হাতপাগুলি শক্ত হয়ে গেছে। গোবর আর মাটির আর্দ্রতা তাদের যেন কিছুটা কোমল করে রাখে। একটি উঁচু টিলার ওপর লছমার পাতার ছোট্ট কুঁড়েখানি চোখে পড়ে।

বাপের চোখ খারাপ, মায়ের আবার হাত ভাঙা। ভাইপো ভাইঝি দুটির মা পরলোকে, আর বাপ সংসারে বিরাগী। ব্যাপার হল এই, লছমা ছাড়া ঐ পরিবারে অন্য কোনো ব্যক্তি এতখানি সুস্থ

নয় যে এই প্রাণীগুলির জীবিকার বিষয় চিন্তা করতে পারে। আর এই নির্জনে লছমা কি ধরনের কাজ করে যে এতগুলি ব্যক্তিকে জীবিত রাখতে পারে, সে সমস্যার সমাধানও সহজ নয়। সুদিনের স্মৃতি হিসেবে যে মোষটি আছে, লছমা তার জন্য ঘাসপাতা নিয়ে যায়। দুধ দোয়, দই জমায়, মাঠা করে। গরমের দিনে কুঁড়ে ঘরের আশেপাশে খানিকটা আলুর চাষ করে। কিন্তু তাতেও যে অভাব দূর হয় না। বস্ত্রের সমস্যা তো লেগেই আছে।

সভ্যতার শেষ চিহ্ন থেকেও ষাট মাইল দূরে এক গ্রামে লছমার বিয়ে হয়েছিল। ওর শ্বশুর-বাড়িতে অনেক জমি, অনেক গরু, মোষ, বলদ—আর সব জিনিসেরই প্রাচুর্য। অথচ ওর কঠোর ভাগ্য এরই মধ্যে তার পরিহাসটুকু লুকিয়ে রাখার স্থান পেয়েছিল। ওর স্বামীকে ঠিক পাগল তো বলা যায় না। তবে তার মানসিক বিকাশ প্রায় একটি শিশুরই মত। পাগল ছেলের বুদ্ধিমতী আর পরিশ্রমী বৌকে শ্বশুর-শাশুড়ি ভালবাসতে পারেন, কিন্তু দেওর-ভাসুরের চোখে ও একটা সমস্যা হয়েই রইল। কারণ ওর উপস্থিতিতেই ওদের ভাইয়ের সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে হয় অথচ ওগুলো আত্মসাৎ করার ইচ্ছাটিও তো দমানো যায় না।

অনেক অত্যাচার সয়েও যখন লছমা নিজের অধিকার ছাড়তে চাইল না তখন একবার ওকে এমন মার দেওয়া হল যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মৃত মনে করে ওরা ওকে লুকিয়ে একটা খাদে ফেলে দিয়ে এল। কি ভাবে ওর জ্ঞান ফিরে এল আর কি অসহ্য কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে খাদের ওপারের গাঁয়ে গিয়ে ও পৌঁছল তা বলা কঠিন। আত্মীয়দের অত্যাচার সম্বন্ধে সেখানে ও একটি কথাও মুখ থেকে বের করল না। কারণ তাতে ওর ঘরের মার্যাদা হানি হবে। তাছাড়া অভিমানিনী লছমা নিজের মার খাওয়ার কথা কি করে পাঁচজনকে বলে? খুব উঁচু পাহাড় থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত

পেয়েছে—এই কল্পিত ঘটনার অসত্য কথার মধ্যে যে সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় তা মার খাওয়ার নিষ্ঠুর কাহিনীর সত্যের মধ্যে দুর্লভ।

পথে তিনদিন কিছু খেতে পায়নি। সে সময়কার কথা এখন হেসে-হেসে বলে, "যখন খুব খিদে পেল তখন হলদে মাটির একটা গোলা বানিয়ে মুখে পুরে চোখ বুজে ভাবলাম—'এই লাড্ডু খাচ্ছি। তারপর অনেকখানি জল খেয়ে নিলাম আর সব ঠিক হয়ে গেল।' মৃত্যুর বৈতরণী পার হয়ে আসা লছমাকে দেখে যখন বাপের বাড়ির লোকেরা ওর শ্বশুর-বাড়ির লোকদের দণ্ড দিতে চাইল তখন লছমা তার তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল।

এই অভাগী স্ত্রীলোকটির ছায়াতেই যেন দুঃখ স্থায়ীরূপে বসতি স্থাপন করেছে। ও ফিরে আসতেই বৌদি একটি বালিকা আর একমাস বয়সের শিশুপুত্রটিকে ওর কোলে রেখে সংসার থেকে চিরবিদায় নিল। লছমার ভাঙা শরীর আর পোড়া কপালের সঙ্গে যে সুস্থ হৃদয় ছিল তারই জোরে সে এই তিক্ত মধুর কর্তব্যভার সামলে নিল। কিন্তু সে বেচারি সন্তান-পালনের কি জানে? কাছাকাছি কোনো ছোট শিশুর মা ছিল না। আর সেই বাচ্চাটি তখনও বাটি থেকে দুধ খেতে শেখেনি। তখন লছমা বুদ্ধি করে নতুন উপায় বের করল। একজনের কাছ থেকে একটি তেলের বোতল নিয়ে তাতে পলতে লাগিয়ে শিশুটিকে জল মেশান মোষের দুধ খাওয়াল। শ্বশুর-বাড়ির অত্যাচারে ওর শরীর জর্জর হয়ে গেছে। কিছু বেশিক্ষণ বসলে পিঠ ব্যথা করে, দাঁড়ালে হাঁটুর শিরায় টান পড়ে। তা সত্ত্বেও অন্য কোনো লোকের সাহায্য ছাড়া রাতের পর রাত খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে, দিনের পর দিন সামনে ঝুঁকে পড়ে, বৌদির উত্তরাধিকারীকে পালন করল। এখন তো বড় হয়ে শিশুটি পোষা জানোয়ারের মত মূকভাবে পিসির পিছু পিছু ঘোরে।

প্রথমবার লছমাকে দেখে আমার ইচ্ছা হল ওকে প্রয়াগে নিয়ে

এসে লেখাপড়া শেখাব। কিন্তু আমার প্রস্তাবের উত্তরে লছমা কেবল নিজের জীর্ণ-শীর্ণ ঘরের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল। এতগুলি প্রাণীকে ও কার ভরসায় ছেড়ে যাবে? প্রথম-প্রথম' ওর আশা ছিল যে পত্নীবিয়োগে অব্যবস্থিতচিত্ত ভাই সম্ভবত ফিরে এসে নিজের কর্তব্যভার তুলে নেবে। কিন্তু সেটা যে দুরাশা তা প্রমাণিত হবার পরও লছমার উজ্জ্বল হাসি নিরাশার ছায়ায় ম্লান হয়নি। সহজভাবে মৃদু হেসে উত্তর দিত, এ জঙ্গলে লেখাপড়া করে কি হবে? এখানে তো গাছে চড়ে লকড়ি ভাঙা, পাতা কুড়নো—এ সবই করতে হবে। যখন বুড়ো মা-বাপ থাকবে না, শিশুগুলিও বড় হয়ে যাবে, তখন কি আর ভগবান অনর্থক ওকে এ পৃথিবীতে ফেলে রাখবেন? ওর এমন জায়গায় অবশ্যই জন্ম হবে যেখানে থেকে ও আমার কাছে লেখাপড়াও শিখতে পারবে আর নিজের কর্তব্য পালনও করতে পারবে। যদি আমি ওকে পড়াতে চাই তো পরজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করব—এ ধরনের অদ্ভুত কথায় অবশ্যই আমার হাসি পেত যদি তাতে কর্তব্যের প্রতি ওর সহজ নিষ্ঠা আর জীবনের প্রতি এতখানি সরল বিশ্বাস না দেখতে পেতাম।

সুখ-দুঃখের মুক্ত আদান-প্রদান যার কাছে চলতে পারে, মিত্র বলতে যদি আমরা তাকেই বুঝি, তবে স্বীকার করতেই হবে বন্ধুর আমার খুবই অভাব। আনন্দ প্রকাশের জন্য আমার কাছে কলার চর্চাই নয় শুধু, গাছপালা, পশুপাখিরও যথেষ্ট স্থান আছে। কারণ ওদের প্রতি প্রসন্নতা ব্যক্ত করেও আমি পূর্ণ সন্তোষ পাই। দুঃখের লেশমাত্রও প্রকাশ করা, অন্য কারো ওপর সে দুঃখের ভার চাপান আমার একটুও ভাল লাগে না।

অন্যদের সুখে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তাদের কাছ থেকে দূরেই থেকে যাই কিন্তু দুঃখী লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাৎসল্য-রূপেই প্রকাশ পায়।

কিন্তু গাছের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হাত আর পাথরের খোঁচায় রক্তাক্ত পা, মলিন অথচ হাসিতে সমুজ্জ্বল লছমার প্রতি আমার মনে একটি সম্মানযুক্ত সখিত্বের ভাবই প্রধান। নিজের দুঃখে ও এতটা অধীর নয় যে আমার সাহায্যের ওর কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে। তাছাড়া অনেকবার অনেক ব্যাপারে আমি ওকে আমার নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে করেছি।

লছমার ব্যবহারেও আমি এ রূপ একটি সমতার ভাব লক্ষ্য করি যা অন্যান্য পাহাড়ি স্ত্রীলোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ওর এবং আমার মধ্যে যে ব্যবধান সে ও ওর সহজ মমতা দিয়ে ভরে দেয়। তাই ওর কাছে পৌঁছবার জন্য আমাকে কিছুই কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।

আমি যে ভাল ভাল রান্না করা তরকারি খেতে পাই সেকথা জেনেও কত যত্ন করে লছমা এমন সব জিনিস নিয়ে আসে যা কেবল জঙ্গলেই পাওয়া যায়। একদিন মৌচাকের মধু নিয়ে দৌড়ে এসে বলল, 'এখনই খেয়ে নাও।' মিষ্টি তো এমনিতেই আমার রোচে না তাতে মধু দেখলে মৌমাছির কথা এভাবে মনে পড়ে যায়, কিছুতেই আর খেতে পারি না। অথচ লছমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটু চেখে দেখতে হল।

ওখানকার অনেক লোক মৌমাছি পুষে মধুর ব্যবসা করে। কিন্তু লছমার তো কাঠের তৈরি ঘর কেনবার সামর্থ্য নেই। ওর ঘরগুলোও এমন ছিল না যাতে মৌমাছিরা ঘর করতে পারে। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঘরের একটা দেয়াল ফেটে যাওয়ায় ওর শখ হল সেখানে মৌমাছি পুষবে! কিন্তু মৌমাছি ওখানে ঢুকবে কি করে? অনেকদিন প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে লছমা ওদের হাতে ধরে এনে ওখানে বসাতে লাগল। কতবার ওরা হুল ফুটিয়ে দিয়েছে, কতবার জায়গাটা অপছন্দ হওয়ায় ওরা উড়ে গেছে। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত কয়েকটি উদার মক্ষিকা বেচারি লছমাকে কৃতার্থ করেছে! সেই মৌচাকের প্রথম মধু ও আজ আমার জন্য এনেছে।

একবার আমার ফিরে আসার দিনে অনেক ঘুরে ঘুরে এক গোছা কালো আঙুর আমাকে উপহার দেবে বলে জোগাড় করে নিয়ে এল। মোষ যখন দুধ দেয়, তখন কাঠের পেয়ালা ভরে দুধ, কখনও দোনায় ভরে দই, কখনও বা পাতার ওপর মাখন নিয়ে দৌড়ে এসে উপস্থিত হয়। গোবর মাটিতে ভেজা পায়ের দাগে আমার শুকনো ফরাস চিত্রিত করে আমার চৌকির কাছে এসে একটু খেয়ে নেবার জন্য অনুরোধ জানায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার শিক্ষা ছাত্রাবাস থেকেই হয়েছে। মাঝে মাঝে যখন বাড়ি যেতাম তখন আমার মা আমাকে খাওয়ানো-দাওয়ানোর চিন্তা করতেন। কিন্তু তাঁর সেই চিন্তা করাটাকে আমি নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই মনে করেছি তাই এই ভাবে খাওয়ানোর চিন্তা করার সঙ্গে আমি বিশেষ অভ্যস্ত নই।

লেখাপড়া শেষ করে আমি নিজেই অনেক বিদ্যার্থীর বিষয়ে চিন্তা করার কর্তব্য স্বীকার করে নিয়েছি। তাই আমাকে সেধে খাওয়াবার লোকের অভাব বরাবরই আছে। লছমা এই যে আমাকে খাওয়াবার জন্য জেদ ধরে, তাতে আমার ওপর আরোপিত আর কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাকে আবার যেন শৈশবের সহজ আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ও নিজের মমতায় অত্যন্ত সরল। আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে লছমাকে এক দিন বললাম, 'এর পর থেকে এখানে এলে আমি সামনের পাহাড়ের নির্জন চূড়ায় কুটির করে থাকব, যাতে কেউ সেখানে না যেতে পারে।'

সব সময় অন্যদের খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা করে-করে ও জেনেছিল, সেই সমস্যার সমাধান সহজ নয় আর তা না করে সংসারে কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। নির্জনে কোথাও গেলে আমি এ সমস্যা

মেটাতে পারব না একথা ভেবে ও আমাকে যা উপদেশপূর্ণ অনুরোধ করল তা কেবল ওরই পক্ষে সম্ভব।

লছমার ইচ্ছা ওর দু বছরের মোষের বাচ্চা যখন চার বছরের হয়ে দুধ দিতে পারবে তখন যেন আমি পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় গিয়ে থাকি। তখন একটা মোষের দুধ বুড়ো-বুড়ি আর বাচ্চারা খাবে আর অন্যটির দুধ আমার জন্য থাকবে। প্রত্যেক দিন নিয়ম করে এক সের দুধ, এক সের দই, দুটি চারটি আলু আর কাঠ, জল—এ সব ও গিয়ে ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ও কথাও বলবে না, তাকিয়ে দেখবেও না, কেবল দরজার কাছে জিনিসগুলি রেখেই ফিরে আসবে। তারপরে যখন আমার মোটা পুঁথি লেখা শেষ হয়ে যাবে আর আমি একা থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে যাবো—তখন 'লছমা', 'লছমা' বলে ডাকলেই শত কাজ ছেড়ে ও আমার কাছে চলে যাবে আর ওখানকার সব জিনিসপত্র নীচে নিয়ে আসবে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করে লছমা যখন অত্যন্ত বিনীত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাল তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। একান্তে নির্জন স্থান সহজেই পাওয়া যায়, মোটা মোটা পুঁথি লিখে ফেলাও কঠিন নয়। কিন্তু লছমার মত অকারণ মমতাময়ী সহায়ক পৃথিবীতে দুর্লভই থেকে যায়।

একবার আমি বসে বসে হিমালয়ের ছবি আঁকছি, দেখে ও বলে উঠল, 'আমার কাছে জিনিস থাকলে আমি ঠিক ঠিক বরফপড়া দেখিয়ে দিতাম।' আমি উপহাসভরে প্রশ্ন করলাম, 'কি কি চাই?' লছমা বিচিত্র ভাবভঙ্গি করে যে উত্তর দিল তাতে বুঝলাম যে একখানা বড় নীল রঙের কাগজ আর শাদা আর সবুজ রঙ চাই। তারপর খুব উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে একটা পাথরের ওপর সেই নীল কাগজখানি বিছিয়ে ও দিনভর বসে বসে আঁকবে। কোথাও দেয়ালের মত খাড়া, কোথাও ছাদের মত বিস্তৃত, কোথাও মন্দিরের

চূড়ার মত হিমালয়কে এঁকে ফেলবে। নীল কাগজ হবে আকাশ, শাদা রঙ.বরফের কাজ করবে আর সবুজ রঙে আঁকা হবে দেবদারু গাছ। লছমার বুদ্ধির এত বড় পরিচয় পেয়ে চকিত হলাম। শাদা কাগজে অনেক কষ্ট করে নীল আকাশ আঁকছি দেখে বোধহয় ও নীল কাগজের কথা ভেবেছে।

ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ওর আঁকার শখ এত যে নিজের ঘরেই নয় শুধু, পড়শিদের ঘরের দেয়ালে পর্যন্ত গিরিমাটি আর চাল দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে। ওর চিত্র রচনায় অর্থ কিছু না থাকতে পারে কিন্তু তাতে ওর অপটু হাতের পরিশ্রমটি ঠিক ধরা পড়ে।

অন্যদের বুনতে দেখে ও নিজেও বুনতে শিখেছিল কিন্তু উল আর কাঁটার অভাবে বুড়ো বাপের জন্য একটা সোয়েটার পর্যন্ত বুনতে পারেনি। অন্যলোকের মুখে সেকথা শুনে আমি ওকে জিনিসপত্র আনিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি ঠিক জানি বাপের শীতে কষ্ট পাবার চিন্তা যদি ওকে বিব্রত না করত তবে ও কিছুতেই সেগুলি নিত না। আমার প্রতি ওর শ্রদ্ধা কম নয়। কিন্তু সেটিকে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে ও কখনও চায়নি।

সাধারণত পাহাড়ি জীবনে অসংখ্য অসুবিধা আর বিবিধ অভাব থাকায় স্বার্থচিন্তা ওদের মধ্যে অত্যন্ত স্থূল আর স্পষ্টরূপে চোখে পড়ে, কিন্তু লছমাকে দেখেছি এর ব্যতিক্রম।

ওর স্বাভাবিক হাসির পিছনে যে অশ্রু তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতাম আর তার কারণ জানতে চাইতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হত—'আমরা তো জংলি লোক, আমাদের আর বেশি কি চাই?' —এসব কথা বলে বলে লছমা আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ করে দিত।

মনের দিক থেকে এতখানি স্বচ্ছ লছমাকে বাইরে মলিনই থাকতে হত। মাঝে মাঝে তো নিজেই বিরক্ত হয়ে বলে উঠত, 'আমি এত

নোংরা, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিও না, বাইরেই বসিয়ে রেখ। দেখ তো সমস্ত ঘর কি রকম হয়ে গেল।' পরমুহূর্তেই আবার নিজের সাফাই দিয়ে বলত, 'পা তো সকালে ঘষে-ঘষে ধুয়েছিলাম। কিন্তু আবার মোষকে ঘাস দিতে যে যেতে হল। ঘাগরাও কাল পাথরের ওপর আছড়ে-আছড়ে ধুয়েছি। বাচ্চাগুলো ধুলোর হাত মুছে কি করে দিয়েছে দেখ। ওড়না পরশু ঝরনায় ধুয়ে শুকিয়েছি; কিন্তু ঘাস বাঁধার দড়ি ছিঁড়ে যাওয়াতে এটা দিয়েই বেঁধে নিতে হল। কি আর করি বল?'

জানি না সে কোন আদ্যিযুগে লছমার একটা কাঠের চিরুনি ছিল। যখন থেকে সেটা হারিয়েছে, তখন থেকে ঝরনার জলে চুল ধুয়ে ওগুলো হাত দিয়ে আঁচড়ে পেছনে ফেলে দেওয়াই ওর একমাত্র প্রসাধন। আমার কাছে একখানা পুরনো কালো চিরুনি উপহার পাওয়া ওর পক্ষে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সে চিরুনিখানা কোমরে গুঁজে পাহাড়ের কোন কোণে, কোন ঝরনার সাহায্যে যে সে শৃঙ্গার করেনি তা বলা কঠিন। কিন্তু লছমার এই বিচিত্র কেশ রচনা আর তাতে প্রসন্নতা দেখে অশ্রু রোধ করা যায় না। শৃঙ্গারের অসংখ্য অভূতপূর্ব দ্রব্যে ভরা এই বিংশ শতাব্দীতেও যে স্ত্রীলোকের পক্ষে এই তুচ্ছ বস্তু দুর্লভ তার দুর্ভাগ্যকে কি নাম দেওয়া যায়?

একবার অন্য কয়েকটি স্ত্রীলোকের কাছে শুনলাম যে ও ধূপ-দীপ দিয়ে তাদের সন্তানদের অমঙ্গল কামনা করে। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে সন্তানের তো নয়, তবে কোন কোন দৃষ্টির অমঙ্গল অবশ্যই ও কামনা করে। অনেক পুরনো, পোকায় খাওয়া দুর্গার একখানি পট ওদের ঘরে আছে। সকাল-সন্ধ্যা তার সামনে আগুন রেখে তাতে সুগন্ধি শুকনো পাতার ধূপ দিয়ে ও প্রার্থনা করে—যে ওর ওপর কুদৃষ্টি দেবে, তার চোখ যেন জ্বলে পুড়ে যায়।

অন্যের দৃষ্টির অমঙ্গল কামনা করেই যে কারো পবিত্রতা রক্ষা

করা যায় না, কারণ বাস্তবিক পক্ষে পবিত্রতার প্রমাণই তো এই যে মলিনতম দৃষ্টিও ওর স্পর্শে পবিত্র হয়ে যাবে—এই সত্য লছমাকে বোঝানো সহজ ছিল না। কিন্তু আমার কথার সূক্ষ্মভাব বুঝে নিতে লছমার কোনোই কষ্ট হল না। তখন থেকে ধূপ-দীপ দিয়ে ও নিজেরই নয় শুধু, অন্যের কল্যাণ কামনাও করে।

এই পর্বতকন্যা যেরকম নির্ভীক তেমনি অটল। অন্ধকার রাতে যেমন সাহসের সঙ্গে পথ খুঁজে বের করে নেয়, সে রকম ঘোরতর বিরোধের মধ্যে ও ভয়শূন্য হয়ে অটল থাকে।

কয়েক বছর আগে লছমা জীবিত থাকার খবর পেয়ে ওর শ্বশুর-বাড়ির সম্পর্কিত কোনো আত্মীয় ওর স্বামীকে সঙ্গে করে ওকে নিতে এসেছিল। ওর বালকবুদ্ধি স্বামীকে ও অনুরোধ করল, ভাইদের সব কিছু সঁপে দিয়ে ওর কাছে এসে যেন থাকে। ও নিজে মোষের ঘরে পড়ে থাকবে কিন্তু স্বামীর থাকার জন্য পরিষ্কার ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে। নিজে দুর্গন্ধ ঘাসের মধ্যে শুয়ে থেকে ও গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে খাট চেয়ে এনে ওকে শুতে দেবে। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে, রাতদিন মজুরি করে ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। লছমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে, তাই ও জীবনভর স্বামীকে ছাড়বে না। কিন্তু স্বামীর ঘরেও যেতে পারবে না। কারণ সেখানকার আত্মীয়রা ওকে মেরে ফেলবে আর এদিকে ওর মা, বাপ, ভাইপো, ভাইঝি—এরা খিদেয় মরে যাবে। স্বামীর বাড়ির লোকেরা কিন্তু ওর স্বামীকে ওখানে ছেড়ে গেল না। কারণ যে মেয়েমানুষ মরেও বেঁচে যায় সেই মায়াবিনী বউয়ের সততার ওপর ওরা বিশ্বাস রাখতে পারে না।

লছমার এই ব্যাপারে গ্রামের আশেপাশে অসন্তোষের ঢেউ খেলে গেল আর ও অনেক রকম সমালোচনার পাত্রী হয়ে উঠল। কারণ সমাজের মনোবৃত্তির যে পরিচয় আমরা সমতল ক্ষেত্রে পাই

ঠিক সেই জিনিসই পর্বতের বিষমক্ষেত্রেও দেখা যায়। একটি পুরুষের প্রতি অন্যায় হয়েছে এই কল্পনাতেই সারা পুরুষসমাজ সেই স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে কৃতসংকল্প। আর একটি স্ত্রীর প্রতি ক্রূরতম অন্যায়ের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সব স্ত্রীলোকরা ওর অকারণ দণ্ডকে আরো ভারি করার চেষ্টা না করে পারবে না।

লছমার মধ্যে আমি অবিচলিত থাকার শক্তি যেমন দেখেছি, আবার অনেক অপকারের চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করার উদারতাও ওর তেমনই দেখলাম। অন্যের নিন্দা করে ও নিজেকে হালকা করে না। নিজের সাফাই দিয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাবও প্রকাশ করে না। ওর দর্পণের মতো মন স্বয়ংই নিজের স্বচ্ছতার প্রমাণ। একবার এক ভদ্রলোক আমার ঘরে বসে লছমার কল্পিত দোষ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। দেখি ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছোট বাচ্চাদের মত মুখ ভেঙাচ্ছে।

রাস্তায় আসা-যাওয়ার পথে ভদ্রলোকেরা যখন ওর মোষ এবং ওর প্রতি একই রকম উপেক্ষাভরা ব্যবহার করেন, তখন ওতো রাগ করে না। উলটে ওঁদের সাফাই দিয়ে বলে, 'আমি তো মানুষের মত নই। ওরা ভদ্রলোক, আমার সঙ্গে কি করে কথা বলবে? আমিও ওদের সঙ্গে কথা বলি না। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলে ভাল করছ না। তবে কিনা তুমি খুব ভাল ভাল কথা বল, তাইতেই আমি তোমাকে সব সময়ে ঘিরে থাকি।'—এসব ভাঙাচোরা কথার অর্থ তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়া সহজ নয়, কিন্তু এটা তো বুঝতেই পারি যে ওর নিজের লঘুতার জন্য সঙ্কুচিত হৃদয়ে কারো প্রতি কোনো খারাপ মনোভাব রাখবারই স্থান নেই।

আমার ফিরে আসার দিন লছমার পক্ষে বড়ই কষ্টের দিন। মোষ দুয়ে একবার দৌড়ে আমার কাছে আসে। জল তোলা সেরে নিয়ে আবার এক চক্কর দিয়ে যায়। বাচ্চাদের রুটি খেতে দিয়ে

আরেকবার ঘুরে যায়। এদিকে আমার জিনিসপত্র যতই বাঁধা-ছাঁদা হতে থাকে, লছমার সমস্ত শরীরের বন্ধন ততই যেন শিথিল হতে থাকে।

আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য ওকে এক মাইল পর্যন্ত আমি আসতে দিই, তারপরে মাইল-চিহ্নের দ্বিতীয় পাথরখানা চোখে পড়তেই ফিরে যাবার নির্দেশ দিলাম। তখন ও দাঁড়িয়ে থেকে বার বার চোখ মুছতে থাকে আর দৃষ্টি দিয়েই কিছু দূর পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করে।

পাহাড়ি রাস্তা আমাদের এখানকার মত লম্বা-চওড়া রাস্তা নয়। চার পা চলতেই হয় ডানদিকে, নয় বাঁ দিকে, মোড় ফিরতে হয়। কখনও কোনো গাছ, কখনও কোন শিলাখণ্ড দৃষ্টি রুদ্ধ করে দেয়। আমার দৃষ্টি পথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও লছমার অশ্রুজলে সিক্ত কণ্ঠ দূর পর্যন্ত শোনা গেল—'সামলে যেও, জলদি জলদি চলে এসো, কেমন ?'

এ সময়ে তবু খিদের কষ্টে লছমার মরবার ভয় থাকে না। আপেল বাগান ফলে ভরে আছে। গাছের নীচে পড়ে থাকা কাঁচা আর টক আপেল ওখানেই শুকিয়ে কি পচে যায়। তাই ওগুলো নিতে কেউ বাধা দেয় না। আজকাল যে কোনো গাছের নীচে বসে লছমা একসের, তিন পোয়া টক আপেল কোনোমতে গলাধঃকরণ করে, তারপরে আবার দুদিন পর্যন্ত কিছু না খেয়ে কাজ করে যায়।

কিন্তু ধীরে-ধীরে শীতকাল আসছে। এবার ধরিত্রীর বুকের ওপর দুঃখভারের মত তিন ফুট উঁচু বরফ জমে যাবে। তখন লোকে নিজের ঘরের আগুন পোয়াতে-পোয়াতে পুরনো-কাহিনী নূতন ঢঙে বলবে। সম্পন্ন আর নির্ধন, সকলেই নিজের সঞ্চিত অন্নের ভরসায় প্রকৃতির এই তরল অথচ ক্রুর ক্রীড়া উপহাস করবে। কিছু সংখ্যক পশু নীচে গরম গ্রামের দিকে পাঠানো হবে আর বাকিরা শুকনো ঘাস

দিয়ে গরম গোয়ালে সুরক্ষিত থাকবে। সেই সময় বৃদ্ধ বাপ, বিকলাঙ্গ মা, অসমর্থ বালক আর অরক্ষিত পশু—এদের নিয়ে লছমা কি করবে ?

আমি ওর কোনো খবর পেতাম না—একথাটা সত্যও আবার অসত্যও। ও লেখাপড়া জানলে চিঠি লেখার সুবিধা হত, একথা শুনে লছমা এক অদ্ভুত ভাবভঙ্গি করে হিন্দিতে উত্তর দেয়—'আমি তো নিজের মত করে চিঠি লিখে নিই। একটি টিলার ওপর বসে ভাবি, এই এই লিখলাম। এটা ঠিক লেখা হ'ল, কিন্তু ওকথাটা লেখা উচিত হয়নি।—আবার কিছুক্ষণ পরে যখন মনে হয় চিঠি চলে গেছে, তখন উঠে পড়ে খুশি হয়ে ঘাস কাটতে লেগে যাই, লকড়ি ভাঙতে শুরু করি। আমার লেখা চিঠি সত্যিই কি তোমার কাছে পৌঁছয়নি !'

কাগজ, কলম, কালি—এমন কি অক্ষর পর্যন্ত ছাড়া আবার পোস্ট অফিসের সহায়তা বিনা পাঠানো এ চিঠির কথা শুনে কার না হাসি পাবে ?

কিন্তু যখন শীতের মধ্যে হঠাৎ এখানকার গরম কামরা ছেড়ে সেই হিমে ঢাকা পর্বতের দিকে যেতে উদ্যত হই, গরমের দিনে সভ্য সমারোহে মুখরিত পার্বত্যশ্রী উপেক্ষা করে সেই নীরব হিমানীর কোণে পৌঁছতে চাই তখনও নিরক্ষর লছমার চিঠি আমি পাইনি, একথা কে বলবে ?

মহাদেবী বর্মা : বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিদের অন্যতমা মহাদেবী বর্মা। অতি শৈশবেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয় সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা এবং সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যার অনুশীলনে। অল্প বয়সেই তিনি বৌদ্ধদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং বৌদ্ধভিক্ষুনী হবার সংকল্পও করেছিলেন। তিনি প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম-এ, পাশ করে 'প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠ'-এর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং এখনও সেই পদে অধিষ্ঠিতা আছেন। তাছাড়া তিনি 'সাহিত্যকার সংসদ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ লেখকদের এবং তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য করা। মহাদেবী বর্মার গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঐ সংসদ ও অন্যান্য সমাজ সেবার কাজে ব্যয়িত হয়।

কবি ও গীতিকার হিসাবে মহাদেবী বর্মা সুবিদিতা। গদ্য-রচনাতেও তাঁর খ্যাতি সমধিক। সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবসর কালে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের লেখাপড়া ও শিল্পকর্ম শেখানো তাঁর ব্রত বলা চলে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি এই মহীয়সী মহিলাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিদানে সম্মানিত করেছেন।

*

মলিনা রায় : মলিনা রায় ১৯১৭ সালে চট্টগ্রামের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি, এ ও ১৯৪০ সালে বি, টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ পরীক্ষায় তিনি বাংলায় সর্বপ্রথম হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক' পান। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম, এ পাশ করেন। হিন্দী ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রভাষা কোবিদ উপাধি প্রাপ্ত হন। ফরাসী ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে। এই ভাষায় তিনি বিশ্বভারতীর ডিপ্লোমা পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বভারতীর পাঠভবনের একজন অধ্যাপিকা। তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত বিনয়গোপাল রায় বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ।

তাঁর 'রামসীতার কথা' পুস্তকটি ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর পরিচালিত লোকশিক্ষা পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে।